মানবাধিকার রিপোর্ট ২০০৮

বাংলাদেশ

বাংলাদেশ একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ। জনসংখ্যা পনের কোটি। ২৯শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা ওয়াজেদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৯৯ টি আসনের মধ্যে ২৩০ টিতে জয়লাভ করে। আন্তর্জাতিক ও দেশী পর্যবেক্ষকরা মনে করেন এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। তবে বিচ্ছিন্ন কিছু অনিয়ম ও বিক্ষিপ্ত কিছু সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। এই নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের শাসনের অবসান ঘটে। বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতার মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। কথা ছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরবর্তী জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করবেন। কিন্তু ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপটে দেশটির প্রেসিডেন্ট ও তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ড. ইয়াজুদ্দিন আহম্মেদ দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর সমর্থনপুষ্ট একটি নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। ২০০৭ সালের জুলাই মাসে ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ প্রতিশ্রুতি দেন যে, ২০০৮ সালের মধ্যেই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর দেশটির বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাধারণভাবে একটা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও এসব বাহিনী প্রায়শ সরকারি কর্তৃত্বের বাইরেও কাজ করেছে।

আলোচ্য বছরে সহিংস ঘটনার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেলেও এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড একটি বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে যায়। এর আংশিক কারণ প্রায় গোটা বছরই বলবৎ থাকা জরুরি অবস্থা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ তদন্ত চালানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। আগস্টে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগে জরুরি ক্ষমতা আইন সাময়িকভাবে তুলে নেয়া হয়েছে এবং পরে ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখ পুরাপুরি তুলে নেয়া হয়েছে। জরুরি আইনের অধীনে বাক স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং জামিন লাভের অধিকারসহ অনেক মৌলিক মানবাধিকার খর্ব করা হয়। জরুরি আইন বলবৎ করার জন্য সরকার ২০০৭ সালে জরুরি ক্ষমতা আইন (ইপিআর) এবং জরুরি বিধিমালা অধ্যাদেশ, ২০০৭, জারি করেন। জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে সরকারের দুর্নীতি দমন অভিযানের সূচনা হলেও এর ন্যায্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রায় গোটা বছরই বলবৎ থাকে - যদিও সেই নিষেধাজ্ঞা সকলের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য হয়নি। নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উলেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, কিন্তু আইনবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু, যথেচ্ছ গ্রেফতার ও আটক, সাংবাদিকদের হয়রানি ইত্যাদি গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কিছু কিছু সদস্য বিচারের আওতার বাইরে থেকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানোর ঘটনা ঘটায়। নারী ও শিশু নির্যাতন বড় সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে, যেমনটা রয়েছে মানব পাচারের সমস্যা।

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা

সেকশন ১: ব্যক্তির মর্যাদার প্রতি সম্মান

ক. জীবনের নিরাপত্তা তথা জীবনের ওপর যথেচ্ছ বা বেআইনী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি

নিরাপত্তা বাহিনী অসংখ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পুলিশ, বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর), সামরিক বাহিনী ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) সময়ে সময়ে অযৌক্তিক শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচার চালায়।

নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে মানুষ খুনের ঘটনা সামগ্রিকভাবে প্রায় ২০ শতাংশ কমে গেলেও সরকার বা সেনাবাহিনী এই সব ঘটনা তদন্তের প্রকাশ্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ ও যৌথ বাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে কোনো ঘটনার জন্যই কারো ফৌজদারি সাজা হয়নি। যে দু'একটি ক্ষেত্রে সরকার অভিযোগ এনেছে তাতে কারো অপরাধ প্রমাণ হলেও তাকে কেবল প্রশাসনিক সাজা দেওয়া হয়েছে।

প্রচার মাধ্যম, স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন এবং সরকারের ভাষ্য মতে, বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাবের হাতে ২০০৮ সালে নিহত হয়েছেন ৬৮ ব্যক্তি। এই বাহিনীর হাতে ২০০৭ সালে যেখানে মাসে গড়ে নিহত হয়েছেন ৮ জন করে, সেখানে ২০০৮ সালে তা নেমে হয়েছে মাসে গড়ে ৬ জনেরও কম। র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যদের নিয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী আলোচ্য বছরে ১৫ জনকে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডগুলোর অনেকগুলোই ঘটেছে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে- হয় আইন প্রয়োগ অভিযানের সময় নয়ত অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক থাকা অবস্থায়। সরকার অবশ্য প্রায়শ এই ধরনের ঘটনাকে র‍্যাব বা পুলিশের সাথে অপরাধী দলগুলোর সংঘটিত "ক্রসফায়ার", "বন্দুকযুদ্ধ", "এনকাউন্টার" বা সংঘর্ষের কারণে মৃত্যুর ঘটনা বলে অভিহিত করেছে।

প্রচার মাধ্যম, স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন এবং সরকারের ভাষ্যমতে এই বছর আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন ১৪৯ জন, তার মধ্যে ১৩৬ জন মারা গেছেন ক্রস ফায়ারে। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, আগের বছরের তুলনায় আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর হাতে নিহত হবার ঘটনা এ বছর শতকরা ১৯ ভাগ কমে গেছে। "ক্রসফায়ারে" র‍্যাবের হাতে মারা গেছেন ৬৫ জন, পুলিশের হাতে ৫০ জন এবং র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী সদস্যদের হাতে ১৫ জন; এবং কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ রাইফেলস এবং যৌথ বাহিনী ক্রসফায়ারে হত্যা করেছে মোট ৬ জন। র‍্যাব বা পুলিশের ক্রসফায়ারে মৃত্যুর ঘটনাকে আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনা বলে অভিহিত করা যায় না বলে ২০০৪ সালে সে সময়কার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বক্তব্য দেওয়ার পর থেকে সরকার এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের জন্য কোন র‍্যাব কর্মকর্তার বিচার হয়েছে কি না তা আর কখনও প্রকাশ করেননি।

শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' জানায়, আলোচ্য বছরে আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনা ঘঠেছে ১১৬ টি। এর মধ্যে কারাগারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৬৬ টি।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অধিকারের রিপোর্ট এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ মতে, ১৮ই জুন তারিখে র‍্যাব ১২'র কর্মকর্তারা কুস্টিয়া জেলার বারদি গ্রামের আব্দুর রশিদ মালিথা এবং নাসিমা আখতার রিক্তাকে গুলি করে হত্যা

করে। নিহতদের পরিবারের সদস্য ও র‍্যাব জানায়, মালিথা পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টি -মার্কসবাদী-লেলিনবাদী (বিপিসিএল-এমএল) জনযুদ্ধের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এলাকার কয়েকটি ছিনতাই ঘটনার তদন্ত করে র‍্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তা এই অভিযান চালান। এই সব ছিনতাই ঘটনার সাথে মালিথার সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে বলা হয়েছে। র‍্যাবের এই অভিযানের সময় মালিথার ভাই গোলাম হোসেন আকাশ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, র‍্যাবের কর্মকর্তারা খুব কাছে থেকে গুলো করে এই দুইজনতে হত্যা করে। ঘটনার ৮ দিন পর র‍্যাব ১২'র হেফাজতে থাকাকালে আকাশের মৃত্যু হয়। যদিও তার বিরুদ্ধে কোন মামলা ছিল না। মালিথা ও রিক্তার ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক জানান, মালিথার বুক ও পাঁজরে ৬টি বুলেটের জখম ছিল, আর রিক্তার মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল এবং রিক্তার পায়ে একটি বুলেটের জখমও ছিল। র‍্যাব কর্মকর্তারা দাবি করেন যে, একটি বাড়িতে ঢোকার সময় তাদের ওপর গুলো চালানো হলে তারা পাল্টা গুলো চালান এবং মালিথা ও রিক্তা এই গুলো বিনিময়ের সময় মারা পড়ে। র‍্যাবের একজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেন যে, রিক্তার বিরুদ্ধে কোন মামলা বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল না। সরকার এই মামলার কোন তদন্ত করেনি।

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, ২৮শে জুন মিরপুর থানার পুলিশ কর্মকর্তারা হাউসপুরে এক ইটের ভাটায় আনোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। ২৬শে জুন দুই জন পুলিশ কর্মকর্তা এবং বেসামরিক পোশাক পরা ৮ থেকে ১০ জন লোক আনোয়ারকে আটক করে। মিরপুর পুলিশ জানায়, পুলিশের সাথে "চরমপন্থীদের" গুলোবিনিময়ের সময় আনোয়ার মারা যায়। তার গ্রেফতার সম্পর্কেও পুলিশ কিছু বলতে রাজি হয়নি। মৃতদেহের ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকও আনোয়ারের মৃত্যুর কারণ বলতে রাজি হননি। তবে মর্গের একজন সহকারী নাকি বলেছেন আনোয়ারের মাথার বাম দিকে একটি এবং বুকে দুটি বুলেটের জখম ছিল। তার যে চোখ বাঁধা হয়েছিল সে আলামতও ছিল। সরকার এই ঘটনার তদন্ত করেনি।

২০০৭ সালের ফেব্রয়ারি মাসে নৌবাহিনীর একটি দলের হাতে নির্যাতিত ও নিহত খবিরুল ইসলামের স্ত্রী নৌ সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার স্বামী আত্মহত্যা করেছিলেন বলে দেয়া ময়না তদন্তের রিপোর্টও তিনি চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা জানায়, অজ্ঞাত মহলের হুমকি এবং টাকার অভাবে তিনি এই মামলা পরিত্যাগ করেন।

২০০৭ সালের মার্চ মাসে মধুপুরে সেনা সদস্যদের হাতে নিহত চলেশ রিছিল হত্যাকাণ্ড, বা র‍্যাব-৫-ব্যাটালিয়নের হাতে ২০০৭ সালের মে মাসে নিহত মোহাম্মদ কামরান ইসলাম মঞ্জুর হত্যা তদন্তে সরকার আর কোন পদক্ষেপ নেননি।

র‍্যাব সদস্যদের হাতে ২০০৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় নিহত ঈমান আলী, এবং ২০০৬ সালে খুলনায় র‍্যাব সদস্যদের হাতে নিহত আব্দুল হাওলাদার বা মোহাম্মদ শামীমের হত্যাকাণ্ডের তদন্তেরও কোন অগ্রগতি নেই।

আগের বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে কম। এর প্রধান কারণ ছিল, জরুরি অবস্থার কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকা। অধিকারের মতে, রাজনৈতিক কারণে ৫০ টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হয়।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডবিউ), অধিকার এবং স্থানীয় পত্র পত্রিকার খবর অনুযায়ী, ১৫শে জুলাই ঢাকায় র‍্যাব ৮'র সদস্যরা বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবদী ছাত্রদলের কর্মী মশিউল আলম সেন্টুকে অযৌক্তিকভাবে আটক করে হত্যা করে। র‍্যাবের দাবি, সেন্টু কয়েকটি হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ছিল এবং তার হাতে

কিছু অবৈধ অস্ত্র ছিল। সেন্টুর পরিবার এ সব অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য- প্রণোদিত বলে অভিহিত করে বলে, এই সকল অভিযোগ থেকে সে অব্যাহতি পেয়েছিল। সেন্টুর পরিবার জানায় যে, সেন্টুকে "ক্রস ফায়ারে" হত্যা করা হবে বলে তাদের আগেই হুমকি দেয়া হয়েছিল এবং এই মৃত্যু ঠেকাতে তার পরিবার তিন লক্ষ টাকা মেজর একেএম মামুনুর রশিদ মামুনকে ঘুষ দেয়। এর পরপর মামুন নাকি সেন্টুর মাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তার ছেলের সাথে দুর্ব্যবহার হবে না। পরের দিন ভোরে লোকজন দেখতে পায় র‍্যাব কর্মকর্তারা বরিশাল শহরের এক ধান ক্ষেতে সেন্টুর লাশ ফেলে রাখছে। সেন্টুর বুকে দুটি এবং পায়ে একটি বুলেটের জখম ছিল। সেন্টুর ঘাড়ে ব্যাপক আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং সম্ভবত তার ঘাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার বাম হাতের অবস্থাও ছিল তাই। অর্থাৎ নির্যাতনের চিত্র ছিল স্পষ্ট। র‍্যাব ৮ পরে জানায় যে, লুকানো অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেন্টুকে বরিশাল নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার সহযোগীরা র‍্যাব লক্ষ্য করে গুলো চালালে সেন্টু "ক্রস ফায়ারে" মারা যায়। সেন্টু হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিচার করার জন্য এইচআরডব্লিউ এক বিবৃতিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সরকার এ ঘটনার আর কোন তদন্ত চালান নি।

এইচআরডবিউ ও অধিকার জানায়, ২৭শে জুলাই পুলিশ নওগাঁয় ডাক্তার মিজানুর রহমান টুটুকে (তিনি টুটুল নামেও পরিচিত ছিলেন) হত্যা করে। তিনি একজন চিকিৎসক এবং পিবিসিপি-এমএল-'র একজন নেতা ছিলেন। কর্তৃপক্ষ দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা ছিল। এসব মামলার মধ্যে ছিল পুলিশ কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ হত্যা। তবে স্থানীয় পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট জানান, তার বিরুদ্ধে কোন মামলা ছিল না। ময়না তদন্ত রিপোর্টে বলা হয় টুটুকে তিন বার গুলি করা হয়েছিল; তাকে বেঁধেও রাখা হয়েছিল এবং দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণের আলামত ছিল। এতে মনে হয়, হত্যা করার আগে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। অধিকার টুটুর এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বলে, পুলিশ কয়েক বছর আগে মারা যাওয়া টুটুল নামের এক অপরাধীর নামের সাথে ডাক্তার টুটুকে গুলিয়ে ফেলেছিল এবং তাকে তার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে তাদের লক্ষ্য বানিয়েছিল।

২০০৭ সালে সংঘটিত আজিবর রহমান হত্যাকাণ্ড বা ২০০৬ সালে সংঘটিত আফতাব আহমদ হত্যাকাণ্ড - কোনটার তদন্তেরই কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই।

প্রচার মাধ্যমের খবরে বলা হয়, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জেনারেল এম এ মতিন ২০০৫ সালে নিহত আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া হত্যাকাণ্ডের তদন্ত পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেন। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জানান, সরকার এই হত্যাকাণ্ডের নতুন করে তদন্ত করবে। কিন্তু কথিত লোকবলের অভাবে এই প্রয়াস থেমে যায়। জেনারেল মতিন এ কথা অস্বীকার করে ঘটনার পুনঃতদন্তের নির্দেশ দেন। বছরের শেষ নাগাদ এই প্রক্রিয়া চলছিল।

২০০৪ সালে সিলেটে হযরত শাহজালালের (র.) মাজারে গ্রেনেড হামলা চালানোর মামলায় ২০০৭ সালে প্রদত্ত এক রায়ে কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামপন্থী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর (হুজির) তিন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড এবং অপর দুই ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকে, তবে আগের বছরগুলোর তুলনায় এর সংখ্যা অনেক কম।

প্রচার মাধ্যমের খবরে বলা হয়, ১২ই ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা পাবনায় পূর্ব বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টির মোঃ ফরমান আলীকে হত্যা করে।

প্রচার মাধ্যম এবং এনজিওগুলো আরো জানায়, ২৬শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে এক বন্দুকযুদ্ধে মহেশখালীতে এক ব্যক্তি প্রাণ হারান।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সহিংসতার সমস্যা রয়েই গেছে, তবে সহিংস ঘটনার সংখ্যা কমে গেছে। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা ২০০৮ সালে ৫৯ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে।

খ. গুম হওয়ার ঘটনা

গুম ও অপহরণের ঘটনা এ বছরও সমস্যা হিসেবেই ছিল। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সমিতির (বিএসইএইআর) হিসাব অনুযায়ী এ বছর ৫০৪ ব্যক্তি অপহরণের শিকার হন। এর মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক ছিল রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত অপহরণ।

পত্র-পত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, ২৬শে সেপ্টেম্বর পাথরঘাটার কচিখালী উপকূল থেকে জলদস্যুরা ৪০ জনেরও বেশি জেলেকে অপহরণ করে। অপহৃতদের বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবনের এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ১০ লক্ষ টাকা (১৪,৭০০ ডলার) মুক্তিপণের জন্য তাদের আটক রাখা হয়। কোস্ট গার্ডের সদস্যরা তাদের উদ্ধারে কয়েকবার অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

পত্র-পত্রিকার খবর এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে জানা যায়, ২৬শে নভেম্বর র‍্যাবের কর্মকর্তারা যুবলীগ নেতা লিয়াকত হোসেনকে আটক এবং গুম করে। দেশের "শীর্ষ ২৩ সন্ত্রাসীর" একজন বলে ঘোষণা দেওয়ার পর ২০০৩ সালে লিয়াকতকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তিনি ৪ঠা সেপ্টেম্বর হাই কোর্ট জামিন পান। ২রা ডিসেম্বর হাই কোর্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার খোঁজ জানানোর জন্য নির্দেশ দেন। সরকার এ ব্যাপারে আর কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অপহৃত আব্দুল আজিজ, জুন মাসে ডেনমার্কের সাহায্য সংস্থার অপহৃত দুই কর্মী, ২০০৬ সালের মে মাসে গুম হওয়া তেরা মিয়ার ঘটনা তদন্তে সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

গ. নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তি

সংবিধানে নির্যাতন চালানো এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর শাস্তিদান নিষিদ্ধ হলেও, র‍্যাব, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রায়শ: আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন এবং নিবর্তনমূলক মনস্তাত্ত্বিক চাপও প্রয়োগ করেছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ২০০৭ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকে এই ধরনের পন্থার প্রয়োগ বেড়ে যায়। তবে আলোচ্য বছরে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা ৬০ শতাংশ কমে গেছে। এসব পন্থার মধ্যে রয়েছে হুমকি প্রদান, মারধর ও বিদ্যুতের শক প্রয়োগ করা। মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায়, এবছর নিরাপত্তা বাহিনী ১২ জনকে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে সরকার কদাচিৎই অভিযোগ এনেছে, দোষী সাব্যস্ত করেছে বা শাস্তি দিয়েছে। আইনের

উর্দ্ধে থাকার এই পরিবেশের কারণে র‍্যাব, পুলিশ এবং সেনাবাহিনী এসব নিষ্ঠুর ও অমানবিক পন্থা অবলম্বনের সুযোগ পেয়েছে।

যেমন, মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায়, ৭ই মার্চ বটিয়াঘাটা পুলিশ আবুল হোসেন ঢালী নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় এবং সেখানে তার ওপর অত্যাচার চালায়। অধিকার জানায়, গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টা পর পুলিশ জানায় যে ঢালী আত্মহত্যা করেছেন। ঢালীর লাশ গ্রহণকারী আত্মীয়রা ঢালীর দেহে নির্যাতনের স্পষ্ট চিহ্ন, ছ্যাকা দেয়ার, ফাঁসিতে ঝুললে ঘাড়ে যে ধরনের দাগ পড়ার কথা তার অনুপস্থিতি, এবং পুলিশের আটক রাখার সেলের অবস্থার কারণে সেখানে আত্মহত্যা করা অসম্ভব বলে দাবি করেছে। ঢালীর আত্মীয়রা আরো দাবি করেন যে, মামলা যাতে না করা হয় সে জন্য পরিবারকে ১৫,০০০ টাকা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল । ২০শে মার্চ ঢালীর পরিবার মামলা দায়ের করেন এবং এই ঘটনা তদন্তকারী সরকারি কমিটির প্রধান এই ঘটনায় পুলিশের অবহেলার কথা অস্বীকার করা যায়না বলে বলেছেন। বছরের শেষ নাগাদও এই মামলা নিয়ে সরকার আর এগোয়নি।

অধিকার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, র‍্যাব-৮ এর কর্মকর্তারা শরিয়তপুর জেলায় মোঃ আফজাল খান নামের এক ব্যক্তিকে ১৮ই মার্চ আটক করে তার ওপর নির্যাতন চালান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, র‍্যাব কর্মকর্তারা আফজালকে মাহমুদপুর বাজারে আটক করেন। সেখানে তারা তাকে তার কাছে থাকা কথিত অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাকে লাঠি, রাইফেল, পাথর ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন। ওই রাতেই পুলিশ আফজালকে শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। এই হাসপাতালেই তিনি পরদিন মারা যান। আফজালের বাবা জানান, আফজালের ঘাড় ভাঙ্গা ছিল, মাথায় ও মুখে জখম ছিল এবং তার পেট ছিল ফোলা যাতে মনে হয় তার পেটে পা দিয়ে সজোরে লাথি মারা হয়েছিল। তার পায়ের রগও কাটা ছিল।

অধিকার জানায়, ছিনতাইয়ের অভিযোগে পুলিশ ১৩ই এপ্রিল মৌলভিবাজারে ফকির চান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। চানের স্ত্রী দাবি করেন যে, আটক থাকার সময় স্বামীর কাছে তাকে যেতে দেয়া হয়নি। তিনি আরো জানান, একজন পুলিশ কর্মকর্তা তাকে বলেন যে, ৫০ হাজার টাকা দিলে তার স্বামীকে ছেড়ে দেয়া হবে। ১৯শে এপ্রিল পুলিশ জানায়, অসুস্থ হয়ে আটক অবস্থাতেই চান মারা যান। নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালের একজন ডাক্তার জানান, সাদা পোশাক পরা কয়েকজন পুলিশ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চানের মৃতদেহ ফেলে যান এবং লাশের পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান। তার দেহে ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক জানান, চানের কব্জিতে দাগ ছিল এবং দেহের অন্যত্র জখমের চিহ্ন ছিল। এতে মনে হয়, কব্জিতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে চানকে মারধর করা হয়েছিল। এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সাইফুল ইসলাম, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট জান্নাতুল হাসান, মামুনুর রশীদ এবং বাবুল আখতারকে তাদের কর্তব্যস্থল থেকে প্রত্যাহার করে। বছরের শেষ নাগাদও এই ঘটনায় আর কোন আইনী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক কর্তৃক ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের কমপক্ষে ৫টি ঘটনার এজাহার দায়ের করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২রা জুলাই র‍্যাব সদস্য আব্দুল গফুর নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে। স্থানীয় পুলিশ গফুরকে গ্রেফতার করে। অধিকার জানায়, বছরের শেষ নাগাদ এই বিচার কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। ৩০শে জুলাই পুলিশের সাব ইনসপেক্টর রেজাউল করিম এক নাবালিকাকে ধর্ষণ

করে বলে অভিযোগ করা হয়। মেয়েটি সে সময় ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনের এক যায়গায় পরিত্যক্ত জিনিস কুড়াচ্ছিল। সরকার এই মামলার কোন তদন্ত করেনি।

কর্তৃপক্ষ ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে বেসরকারি সংস্থা উত্তরণের পরিচালক শহীদুল ইসলামের ওপর চালানো নির্যাতন, বা ওই বছরেরই জুন মাসে মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন এবং মোহাম্মদ কাজলের ওপর চালানো নির্যাতন মামলার কোন তদন্ত করেনি।

করিমগঞ্জের সাব-ইনসপেক্টর নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের মে মাসে আনা ধর্ষণ মামলা বা মিরপুরের সাব ইনসপেক্টর আব্দুল মান্নানের বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে আনা ধর্ষণ মামলা -কোনটারই কোন অগ্রগতি হয়নি।

২০০৬ সালের কিশোর কুমার দাসের মামলারও কোন অগ্রগতি হয়নি।

২০০৬ সালে কুড়িগ্রামের তাজুল ইসলাম হত্যা মামলা বা ২০০৬ সালে মুন্সীগঞ্জের আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফ হোসেন খানের মামলারও কোন অগ্রগতি নেই। আশরাফ খানকে র‍্যাব আটক করে নির্যাতন চালায় এবং ক্রসফায়ারে হত্যা করার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা আলোচ্য বছরে বেড়ে যায়। পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী, গণপিটুনিতে ২০০৮ সালে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬৩ ব্যক্তি। যদিও স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানায়, প্রকাশিত এই সংখ্যা সংঘটিত প্রকৃত সংখ্যার ভগ্নাংশ মাত্র। ২০০৭ সালে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল ১০৮টি।

পত্র-পত্রিকার খবর অনুযায়ী, ৩রা মার্চ নাসিরাবাদে ৪ জনের একটি দল এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার সময় জনতা বাবুল (৩৫) নামের এক ছিনতাইকারীকে মেরে ফেলে এবং অপর একজনকে আহত করে।

ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে ৮ই মার্চ ক্ষুব্ধ জনতা দুই জন ডাকাতকে মারধর করে। এতে কবির মিয়া (৩০) এবং আনোয়ার হোসেন (৩৫) নামের দুই জন প্রাণ হারায় এবং অপর একজন আহত হয়। পুলিশ জানায়, এই লোকেরা রাত তিনটায় স্থানীয় এক বাড়িতে ডাকাতি করার চেষ্টা চালাতে গেলে প্রতিবেশীরা তাদের ধরে ফেলেন।

কারাগার এবং ডিটেনশন কেন্দ্রগুলোর অবস্থা

জেলখানা ও বন্দিশালাগুলোর অবস্থা শোচনীয়ই রয়ে গেছে। এতে তিল ধারণের জায়গা নেই, নেই পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুব খারাপ। স্থানীয় মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, আটক অবস্থায় মৃত্যুর যেসব ঘটনা ঘটে থাকে তার জন্য মূলত জেলখানার এই করুণ অবস্থা দায়ী। আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ মতে, দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকে সামরিক বাহিনীসহ নিরাপত্তা বাহিনী আটককৃত অনেক ব্যক্তিকে সারা দেশে যৌথ বাহিনীর অতি নিম্নমানের অস্থায়ী ক্যাম্পে এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই'র সামরিক ক্যাম্পে রেখেছেন।

অধিকারের মতে আলোচ্য বছরে ৬৬ ব্যক্তি মারা গেছেন জেলখানায় এবং পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মারা গেছেন ৫০ জন। এদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে যথাযথ যত্নের অভাবে এবং ৪৬ জনের মৃত্যু ঘটেছে অস্বাভাবিক কারণে।

সরকার জানায়, ৩১ শে ডিসেম্বর দেশের জেলখানাগুলোয় মোট বন্দির সংখ্যা ছিল ৭৫,৪৮০ জন যা দেশের জেলখানাগুলোর মোট বন্দি ধারণ ক্ষমতার ২৭৮ শতাংশ বেশি। দেশের জেলখানাগুলোয় মোট বন্দি ধারণ ক্ষমতা ২৭,১৪৬ জন। মোট বন্দির মাত্র এক তৃতীয়াংশ সাজাপ্রাপ্ত। বাকিরা হয় বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন নয়ত তদন্তের জন্য তাদের আটক করা হয়েছে। ব্যাপক মামলা জটের কারণে বিচারের অপেক্ষায় থাকা অনেকে তারা যেসব অপরাধে অভিযুক্ত সেসব অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদের চেয়ে বেশি দিন ইতিমধ্যেই কারাগারে অতিবাহিত করেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বন্দিদেরকে পালাক্রমে ঘুমাতে হয়েছে এবং তাদের পর্যাপ্ত শৌচাগার সুবিধাও ছিল না।

২০০৭ সালে কারা মহাপরিদর্শক কারাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে কয়েকটি পদক্ষেপ নেন। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে জেল কোড হালনাগাদ করা, জেলের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি হ্রাস করা এবং জেলের ভেতর মাদক কেনাবেচা বন্ধ করা, শৃঙ্খলার প্রয়োজন ছাড়া ডাণ্ডা-বেড়ির ব্যবহার সীমিত করা, বন্দিদের খাবারের মান বাড়ানো, তাদের জন্য আরো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সাক্ষরতা কর্মসূচি বাড়ানো এবং কারারক্ষীদের মনোবল বৃদ্ধি করা। সরকার মহিলাদের জন্য দেশের প্রথম জেলখানা চালু করে গাজীপুরে। এনজিওগুলো জানায় যে, এসব সংস্কারে ভালো ফল হয়েছে, তবে সংস্কারের পর এসব পুরাপরি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি এবং অলোচ্য বছরে সংস্কারের এই গতি পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ছিল ধীর। সংস্কারের মধ্যে রয়েছে মহিলাদের জন্য পৃথক তিনটি নতুন কারাগার নির্মাণ, বন্দিদের জন্য পোশাক তৈরি বিষয়ে কয়েকটি ছোট আকারের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা, এবং তাদের জন্য টেলিভিশন সেট, ফ্যান প্রভৃতি কিছু জিনিস সরবরাহ করা। আলোচ্য বছরে কারা মহাপরিদর্শক ছোট-খাট অপরাধীদেরকে জেলের সেলে কোন রকম বেড়ার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে দেখা করতে দিয়ে বন্দিদের বনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা চালান।

আইন অনুযায়ী শিশু-কিশোর বন্দিদেরকে বয়স্ক বন্দিদের থেকে আলাদাভাবে রাখার কথা; কিন্তু বাস্তবে অনেক বন্দি শিশু-কিশোরকে বড়দের সাথে এক সঙ্গে রাখা হয়েছে। কম বয়েসীদের আটক রাখা আইনত নিষিদ্ধ হলেও এবং এ ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পত্র-পত্রিকার খবরে বলা হয়, দেশে ৩৮০ জনের মত শিশু বন্দি রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সংখ্যা অনেক বেশি; কেননা, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় বয়স নিরূপণের যথাযথ ব্যবস্থা নাই বলে অভিযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক বন্দি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের মতে, অল্প বয়সী বন্দির সংখ্যা জনসংখ্যার ০.৪ শতাংশ।

আইন অনুযায়ী যদিও ধর্ষণ, পাচারের শিকার এবং ঘরে সহিংসতার শিকার "নিরাপত্তা হেফাজতে" থাকা মহিলা বন্দিদেরকে অপরাধীদের থেকে আলাদা করে রাখার কথা; কিন্তু এসব মহিলাদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা ছিল না।

আন্তর্জাতিক রেডক্রসসহ স্বাধীন মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদেরকে সরকার সাধারণভাবে জেলখানা পরিদর্শনের অনুমতি দেননি। স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে সরকার গঠিত কমিটিগুলো মাসে একবার করে জেলখানাগুলোর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেও এসব কমিটি তাদের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশ করে। জেলা জজগণ কখনও কখনও জেলখানা পরিদর্শন করলেও তারা কদাচিৎ তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন।

ঘ. যথেচ্ছ গ্রেফতার ও আটক

সংবিধানে যথেচ্ছ গ্রেফতার বা আটক নিষিদ্ধ। তবে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার বা আটক করার অনুমতি আইনে রয়েছে। ২০০৭ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারির পর সরকার জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা জারি করে। এই বিধি কর্তৃপক্ষকে কারো বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক বা সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না এনেও তাকে আটক করার আরো ক্ষমতা দেয়। সরকার আগস্ট মাসে এবং ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে জরুরি অবস্থা শিথিল করে এবং অবশেষে ১৭ই ডিসেম্বর তা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে।

পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয়ভাবে সংগঠিত পুলিশের দায়িত্ব অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। সাম্প্রতিক সরকারগুলোর আমলে পুলিশ সাধারণভাবে ক্ষমতাসীন দলের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্তে অকার্যকর এবং অনিচ্ছুক ছিল। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর সরকার পুলিশ, র‍্যাব ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে যৌথবাহিনী গঠন করেন এবং নবগঠিত এই বিশেষ দলগুলোকে জরুরি অবস্থা কার্যকর করার দায়িত্ব দেন। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই জরুরি অবস্থা কার্যকর করায় মুখ্য ভূমিকা নেয়। তারা নানা জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

ইউএনডিপি, ব্রিটিশ সরকার এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার (বিএসইএইচআর) র‍্যাবকে মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই বাহিনী কর্তৃক গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত থাকলেও সংঘঠিত মোট ঘটনার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

পুলিশের ব্যাপক দুর্নীতি এবং তাদের শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের অভাব দূরীকরণের বিষয়ে সরকার পদক্ষেপ নেয়। পুলিশের মহাপরিদর্শক পুলিশের প্রশিক্ষণ, দুর্নীতি দমন ও এই বাহিনীকে আরো দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক দাতাদের আংশিক অর্থায়নে একটি নতুন কৌশল বাস্তবায়ন শুরু করেন।

ঢাকার ব্যবসায়ী মাহবুব আলম লিটনকে সেনা সদস্য কর্তৃক মারধর করার ২০০৭ সালের মামলার কোন অগ্রগতি হয়নি।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় শুটিং ফেডারেশন কমপেক্সের ঘটনার ব্যাপারেও কোন অগ্রগতি হয়নি। ওই ঘটনায় পুলিশ ঢাকার ওই কমপ্লেক্সে ঢুকে ২৫ জনকে মারধর করে। এদের মধ্যে আসিফ হোসেন খানও ছিলেন।

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ২০০৬ সালের আগস্টে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারেও কোন অগ্রগতি হয়নি। ওই ঘটনায় পুলিশ ও বিডিআর জনতার ওপর গুলি চালিয়েছিল যাতে ৫ জন নিহত এবং ১০০ জন আহত হয়েছিলেন।

বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা এবং পুলিশের পাল্টা প্রতিশোধের ভয়ে খুব কম মানুষই পুলিশের অপরাধমূলক কাজকর্মের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। পুলিশকে মোকাবিলা করার এই অনীহা পুলিশ সদস্যদের জন্য একটি দায়মুক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

গ্রেফতার ও আটক

আইনে আছে যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াও গ্রেফতার করার বিধান রয়েছে। ফৌজদারি দণ্ড বিধির ৫৪ ধারা এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশের ৮৬ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই সন্দেহভাজন অপরাধীদের আটক করা যায় এবং সরকার এসব ধারার সুযোগ নিয়েছে নিয়মিতই। চার জনের বেশি লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করার আইনও রয়েছে। প্রতিরোধমূলক ও যথেচ্ছ আটকের ঘটনা আগের বছরের চেয়ে কমেছে, তবে মোট আটকের সংখ্যা জরুরি অবস্থা জারির আগের চেয়ে অনেক বেশি রয়ে গেছে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায় যে, আলোচ্য বছরে সরকার বিশেষ গ্রেফতার অভিযানে ৬০, ৫১৮ ব্যক্তিকে আটক করে। এর মধ্যে জুন মাসেই আটক করে ৩০ হাজারেরও বেশি লোককে। আটকের এই সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের আটকের সংখ্যার চেয়ে মোটামুটি ৮০ শতাংশ কম। তবে প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া ছিল দুষ্কর, কেননা সরকার আটক ব্যক্তির সংখ্যা প্রকাশ করার রীতি থেকে সরে এসেছে। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে) জানায়, দৈনিক গড়ে প্রায় দুই হাজার লোককে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের বেশিরভাগকেই আটক করার দুই এক দিনের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। দি ডেইলি স্টার পত্রিকার খবরে জানা যায়, অনেককে ছেড়ে দেয়া হলেও দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অন্যান্য সন্দেহে ১৫০ জনের মত সাবেক রাজনীতিক, আমলা এবং ব্যবসায়ী নেতা আটক রয়েছেন; এবং আলোচ্য বছরে ৭৮ জনেরও বেশি লোককে আটক করা হয়। সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের তালিকায় ২২২ জনের বেশি লোকের নাম ছিল। অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে ৯৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

২৮শে মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত সময়ে কর্তৃপক্ষ প্রায় ৩২ হাজার লোককে অটক করে। বলা হয়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য এই আটক করা হয়েছে। রাজনৈতিক দল এবং এনজিওগুলো এই আটককে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করে অভিযোগ করেছে যে, চরমপন্থী ও অপরাধীদের পাশাপাশি ৩৫০ জনের মত স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মী এবং কর্মকর্তাকে আটক করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা জানান, যাদের আটক করা হয়েছে তাদের বিদ্যমান গ্রেফতারি পরোয়ানার অধীনে আটক করা হয়েছে; এবং মাত্র ১৯১ জনকে জরুরি ক্ষমতা আইনে আটক করা হয়। কর্তৃপক্ষ আরো দাবি করে যে, আটককৃতদের মধ্যে ১০০'রও কম ব্যক্তির সাথে রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আটকের পরপরই আটককৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানায়, সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে সেনা ছাউনী, ডিজিএফআই সদর দফতর এবং অন্যান্য বেসরকারি যায়গায় অবৈধভাবে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়, কখনও কখনও মারধর করে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ছেড়ে দেবার আগে বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করার আগে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন অন্যান্য বিশিষ্টব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে রাজি হওয়ার পর বন্দিদের ছেড়ে দেয়া হয়।

যৌথ বাহিনীর হাতে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে গ্রেফতার হওয়া গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের মামলার ব্যাপারে কোন অগ্রগতি নেই।

জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হতে পারে এমন কোন কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য বিশেষ ক্ষমতা আইনে কোন ব্যক্তিকে সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ৩০ দিনের আটকাদেশ দিতে পারেন। তবে কর্তৃপক্ষ এর চেয়ে বেশি সময় ধরে তাদের আটক রেখেছেন। এই ধরনের আটকের বেলায় ম্যাজিস্ট্রেট আটক ব্যক্তিকে আটক রাখার কারণ জানাবেন এবং আটকের মেয়াদ চার মাসের বেশি হলে উপদেষ্টা বোর্ড আটককৃত ব্যক্তির বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবেন। আটক ব্যক্তিদের আপিল করার অধিকার রয়েছে। সরকারের দুর্নীতি দমন অভিযানের সময় আটক অনেক ব্যক্তিকে এই আইনের ধারায় আটক রাখা হয়েছে এবং সরকার এসকল ব্যক্তির অনেকের আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দুই জন বিচারক ও একজন সরকারি কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা বোর্ডে বহুবার আবেদন করে মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছে।

সাধারণ আদালতে জামিন নেয়ার একটি বিধান প্রচলিত ও কার্যকর রয়েছে কিন্তু জানুয়ারি থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে জরুরি বিধিমালার আওতায় যাদের বিচার হয়েছে তারা জামিন পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না। জরুরি বিধিমালায় আটক ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদেরকেও অপরাধে সহযোগিতা করার সন্দেহে প্রায়শই জামিন ছাড়াই আটক রাখার ঘটনা ঘটেছে। এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ জরুরি ক্ষমতা বিধির আওতায় জামিন আবেদন শুনানির হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করে, যার ফলে হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুর করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মানবাধিকার সংস্থাগুলো এবং অভিযুক্তদের কয়েকটি পরিবার অভিযোগ করে যে, আটককৃত বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির বেলায় হাইকোর্ট জামিনের আদেশ দিলেও সামরিক বাহিনী বিচারিক আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ওই বন্দির মুক্তি বিলম্বিত করেছে যাতে করে সরকার ওই বন্দির বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দায়ের করতে পারে। আর এ ধরনের ঘটনায় আপিল প্রক্রিয়া আবার নতুন করে শুরু করতে হয় এবং আটক ব্যক্তির মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়না।

ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে আটক বেশির ভাগ ব্যক্তি আইনজীবীর সুবিধা পেয়েছেন। তবে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় আটককৃতরা এই সুযোগ পাননি। সরকার আটক ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে আইনজীবী নিয়োগ কদাচিৎই করেছেন; এবং এই ধরনের বন্দিদের আর্থিক সহায়তা করার মত আইন সহায়তা কর্মসূচি খুব কম রয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে যাদের আটক করা হয় তারা অনেকেই উচ্চ আয়ের মানুষ, বিধায় সরকারের আইনী সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হতেন না। সাধারণত আদালতে মামলা দায়ের করার পরেই কেবল সরকার আইনজীবীদেরকে তাদের মক্কেলদের সাথে সাক্ষাৎ করার আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি দিয়েছেন। আর অনেক ক্ষেত্রে এই সব মামলা দায়ের হয়েছে কাউকে আটক করার বেশ কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের পর। আলোচ্য বছরে যথেচ্ছ আটকের ঘটনা ছিল সাধারণ ব্যাপার এবং সরকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অনেককে আটক রেখেছেন। অনেক সময়ই এটা করা হয়েছে অন্যান্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য।

রাজনৈতিক কারণে ঠিক কত জনকে আটক রাখা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। জরুরি অবস্থার সময় আটক অনেক পদস্থ ব্যক্তিই দুর্নীতির সাথে জড়িত বলে ব্যাপকভাবে সন্দেহ করা হয়। এদের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ আলোচ্য বছরের শেষ পর্যন্ত ছিল। বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ কয়েকজন শীর্ষ ব্যক্তিকে কোন মামলা ছাড়াই কয়েক মাস ধরে আটক রাখা হয়। আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলো সরকারের বিরুদ্ধে বেছে বেছে কাউকে কাউকে বিচারের আওতায় আনার অভিযোগ এনেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, দুর্নীতিগ্রস্ত বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হলেও দুর্নীতিবাজদের নামের তালিকায় কয়েকজন শীর্ষ ব্যক্তির নাম নেই। অভিযোগ রয়েছে যে, এসব ব্যক্তি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং

সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করতে রাজি হওয়ায় দুর্নীতিবাজদের নামের তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেয়া হয়।

জরুরি অবস্থা বা দুর্নীতি দমন অভিযানের সাথে সংশিষ্ট নয়- এমন মামলাগুলোর ক্ষেত্রে যথেচ্ছ এবং দীর্ঘমেয়াদী বিচারপূর্ব আটক রাখার ঘটনা সমস্যা হিসাবে ছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জট ছিল ১৮ লাখেরও বেশি। আটককৃতদের অনেকেই বিচারের আগেই এতটা সময় ধরে আটক আছেন যে, তাদের কথিত অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা হলেও তাদেরকে এই সময়ের চেয়ে কম সময় জেলে থাকেতে হত। আন্তর্জাতিক বন্দি অধ্যয়ন কেন্দ্রের হিসাব মতে ২০০৮ সালের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের কারাগারগুলোর মোট বন্দির প্রায় ৭০ শতাংশই ছিলেন বিচারপূর্ব আটক অবস্থার বন্দি।

ঙ. প্রকাশ্য ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চনা

আইনে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে বাস্তবে সংবিধানের একটি অস্থায়ী ব্যবস্থার আওতায় দীর্ঘদিন ধরে নির্বাহী বিভাগ নিম্ন আদালত, বিচার বিভাগীয় লোকবল নিয়োগ এবং এর কর্মীদের বেতন ভাতাদি নিয়ন্ত্রণ করে। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূর্ববর্তী সরকার প্রণীত আইন বাস্তবায়ন করে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করে।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্ট ডিভিশনের রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত কোন রায় সরকারের বিরুদ্ধে গেলে প্রায়শই সেগুলো খারিজ করে দেয়ার চর্চা এপ্রিল মাস থেকে বন্ধ করে। মার্চ মাস শেষ হবার আগে আগে আপিল বিভাগ শীর্ষ ব্যক্তিদের জামিনের কয়েকটি সিদ্ধান্ত বাতিল করে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে একজন নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগদানের পর এই চর্চা বন্ধ হয়। হাইকোর্টের বিচারকবৃন্দ এপ্রিল মাস থেকে হাজার হাজার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অপরাধীদের জামিন দেন এবং আলোচ্য বছরের শেষ পর্যন্ত তা বহাল ছিল। দুর্নীতি, বিচার বিভাগীয় অদক্ষতা, সম্পদের ঘাটতি এবং বিশাল মামলা জট বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মারাত্মক সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

বিচার ব্যবস্থার রয়েছে দুটি স্তর: নিম্ন আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট। উভয় আদালতেই দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার শুনানি হয়। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার পর সরকার নিম্ন আদলতে বিচার পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের স্থলে বিচার বিভাগীয় ম্যাজস্ট্রেট নিয়োগ দেন। সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে দুটি শাখা: হাইকোর্ট বিভাগ এবং আপিল বিভাগ। এর মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগ সংবিধান সংশিষ্ট মূল মামলা এবং নিম্ন আদালত থেকে আসা মামলা পর্যালোচনা করে। আপিল বিভাগের রয়েছে হাইকোর্ট বিভাগ থেকে আসা মামলার রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডের ব্যাপারে আপিলের শুনানি অনুষ্ঠান করা। আপিল বিভাগের দেয়া রুলিংই অন্য সকল আদালতের রায়ের ওপর প্রযোজ্য হয়।

জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা সরকারকে দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচালিত মামলার সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য দুর্নীতি বিরোধী বিশেষ দ্রুত বিচার আদালত গঠন করার ক্ষমতা দিয়েছে। এসব ট্রাইবুনালের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধেও হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যায়।

২০০৫ সালে হাইকোর্টের একটি প্যানেল ১৯৮০র দশকের সামরিক শাসনকে বৈধতা দানকারী একটি সংশোধনীকে সংবিধানপরিপন্থী বলে আদেশ দেয়। প্রধানমন্ত্রীর দফতর এই আদেশের ওপর স্থগিতাদেশের ব্যবস্থা

করে- যা বছরের শেষ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। প্যানেলের এই আদেশ সে সময়কার প্রধানমন্ত্রীর স্বামী সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আমলের সামরিক শাসনের ব্যাপারে নানা প্রভাব ফেলতে পারে এই শঙ্কায় এই স্থগিতাদেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিচার প্রক্রিয়া

আইনে বলা আছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার পক্ষে উকিল নিয়োগ করতে, তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পর্যালোচনা করতে, সাক্ষীর সাহায্য নিতে এবং তার বিরুদ্ধে দেয়া রায়ের রিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। কোনো জুরি থাকেন না। সকল মামলার শুনানি বিচারকরাই করে থাকেন। শুনানি হয় প্রকাশ্য। রাষ্ট্র খুব কম ক্ষেত্রেই অভিযুক্তের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করেছে। বিবাদীকে নির্দোষ বলেই ধরে নেয়া হয়, রায়ের বিরুদ্ধে তাদের আপিল করার অধিকার রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কি প্রমাণাদি রয়েছে তা দেখার অধিকারও তাদের রয়েছে।

দুর্নীতি এবং মামলার ব্যাপক জট দেশের বিচার ব্যবস্থার বড় প্রতিবন্ধক। এছাড়া বিচারে প্রায়শই অধিক সময় ব্যয় হয়, সাক্ষীদের প্রভাবিত করার ঘটনা ঘটে, ক্ষতিগ্রস্তদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ গায়েব হয়ে যায়। এসব কারণে ন্যায় বিচারপ্রাপ্তি বিঘ্নিত হয়। মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায়, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী এবং আদালতের কমীরা জরুরি ক্ষমতা আইনের আওতায় দায়ের করা বেশির ভাগ মামলার বিবাদীদের কাছ থেকে ঘুষ দাবি করেছেন।

জনগণ তাদের অভিযোগ মধ্যস্থতার জন্য বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন। সরকারি সূত্র মতে, দেওয়ানি মামলায় মধ্যস্থতার ব্যাপকতর ব্যবহারের ফলে বিচার প্রদান দ্রুততর হয়েছে, তবে এই ব্যবস্থা কতটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে তার কোন মূল্যায়ন করা হয়নি। মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য উত্তরাধিকার, নিবন্ধিত বিয়ের তালাক, ইত্যাদি চিরাচরিত মুসলিম আইন বিধিবদ্ধ করা রয়েছে। দেশের হিন্দু এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যও অনুরূপ পৃথক পৃথক আইন চালু ছিল।

রাজনৈতিক বন্দি ও আটক ব্যক্তি

দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের অংশ হিসাবে সরকার প্রায় ১৫০ জন উচ্চ পর্যায়ের রাজনিতিবিদ, ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তাকে আটক করেন। আদালত এ বছরে তাদের বেশির ভাগকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সরকার অনেককেই কোন অভিযোগ দায়ের করা ছাড়া বিশেষ ক্ষমতা আইনে কয়েক মাস আটক রাখেন।

সরকার ২০০৭ সালে সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খাদেলা জিয়াকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার জুন মাসে সরকারের নির্বাহী আদেশে শেখ হাসনিাকে প্যারোলে মুক্তি দেন। সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট খালেদা জিয়াকে জামিনে মুক্তি দেন।

বছরের শেষ নাগাদ দুর্নীতি দমন কমিশন এবং পাবলিক প্রসিকিউটর বা প্রধান সরকারি উকিল শীর্ষ রাজনীতিবিদদের ২২৮টি মামলার বিচার করেছে। চাঁদাবাজি, বিদেশে টাকা পাচার, হত্যা, ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ আনা হয় এদের বিরুদ্ধে। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে আনা এই সব অভিযোগকে সরকার বৈধ বললেও কোন কোন মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বিবেচনা করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাবেক আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের বিরুদ্ধে আনীত ২০০৭ সালের মামলা আলোচ্য বছরের শেষ নাগাদও বহাল ছিল। হাইকোর্ট অবশ্য ৯ই সেপ্টেম্বর তাকে জামিনে মুক্তি দেয়। সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু দেশ থেকে চলে যাবার পর তার অনুপস্থিতিতে বিচার হয় এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৩ বছরের কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

২০০৩ সালে ইসরাইলে যাবার চেষ্টা করার সময় আটক সাংবাদিক সালাহ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরীর বিচার জুন মাসে শুরু হয়। মামলাটি অব্যাহত রয়েছে এবং সরকার তাকে বিদেশ ভ্রমণ করতে দিয়েছে।

দেওয়ানি বিচার ও প্রতিকার পদ্ধতি

আলোচ্য বছরে সরকার দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করেনি।

সম্পত্তি প্রত্যর্পন

আলোচ্য বছরে সরকার ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর প্রধানত হিন্দুদের ফেলে যাওয়া যে সব সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন সেগুলো তার মালিকদের কাছে ফেরত দেয়ার কথা বলা হয়েছে এই আইনে।

চ. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, বাড়িঘর বা যোগাযোগের গোপনীয়তায় যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ

প্রচলিত আইনে গোয়েন্দা বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর অনুমতি নিয়ে কারো যোগাযোগের ওপর নজরদারি করতে পারেন। এই অধ্যাদেশ বলে সরকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কারো টেলিফোন বার্তা প্রাপ্তি বন্ধ করতে পারেন। জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ব্যক্তিগত যোগাযোগ, যেমন টেলিফোন ও মোবাইল ফোনে কথাবার্তা, ই-মেইল, সংক্ষিপ্ত বার্তা (এসএমএস) ইত্যাদির ওপর সরকারি নজরদারি করার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেয়। জাতীয় জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার এসব যোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের যে কোন লাইসেন্স বাতিল করার ক্ষমতা রাখে এবং এ জন্য সরকারকে কোন ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। ২০০৭ সালে সরকার মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সার্ভিস মাঝেমধ্যে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়।

পত্র-পত্রিকার খবরে বলা হয়, আলোচ্য বছরে ফোন বার্তা গোপনে মনিটর করা ও শোনার কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় মনিটরিং কেন্দ্র খোলে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের সাথে সংশিষ্ট নয়- এমন ধরপাকড়ের বেলায়ও পুলিশ খুব কমই গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যবহার করেছে এবং যে সব পুলিশ কর্মকর্তা এই সব নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছেন তাদের কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানায়, পুলিশের বিশেষ শাখা, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা শাখা এবং ডিজিএফআই সরকারের রাজনৈতিক বিরোধী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি করার কাজেও লোক লাগায়।

সেকশন ২: নাগরিক অধিকারের প্রতি সম্মান

ক. বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবিধানে বাক স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ আছে, তবে সরকার জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ব্যবহার করে এসব অধিকার খর্ব করেছেন। সেপ্টেম্বর মাসে সরকার সাংবাদিক ও জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য তথ্য অধিকার আইন অনুমোদন করেন।

প্রতিশোধের ভয় ছাড়া কিছু কিছু ব্যক্তিবর্গ নির্ভয়ে সরকারের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে পারেননি। সরকারের প্রকাশ্য সমালোচনা হরহামেশাই করা হয়েছে, তবে সাংবাদিকরা স্ব-উদ্যোগে খবর প্রকাশে সংযমী ছিলেন। জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় ঘরোয়া ও প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং সরকারের সমালোচনাকারী সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার এবং সরকারকে সমর্থন করে খবর প্রচার ও প্রকাশ করতে বাধ্য করার কর্তৃত্ব দেয়া হয় সরকারকে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে সবসময় এই নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়নি। ৩রা নভেম্বর সরকার রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। সভা-সমাবেশের খবর এবং তথাকথিত উষ্কানিমূলক খবর, সম্পাদকীয় ও অলোচনা অনুষ্ঠান প্রকাশ ও প্রচার করার ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা জরুরি ক্ষমতা বিধির যে ধারায় সন্নিবেশিত ছিল তা সরকার রদ করে। এসব বিধি-নিষেধ সরকার ১৭ই ডিসেম্বর তুলে নেয়।

দেশে শত শত স্বাধীন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে। যেসব পত্র-পত্রিকা সরকারের, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর সমালোচনা করেছে তাদের ওপর সারা বছরই প্রবল চাপ ছিল। সরকারি মালিকানাধীন একটি বার্তা সংস্থা ছাড়াও আরো দুটি বেসরকারি বার্তা সংস্থা রয়েছে।

কখনও কখনও পত্র-পত্রিকার মালিকানা এবং খবরের বিষয়বস্তু আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ অধিদফতর (আইএসপিআর) এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের (ডিজিএফআই) সরাসরি বিধিনিষেধের আওতায় ছিল। সরকার ও সেনাবাহিনীর সমালোচনা করলে সাংবাদিকদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে বলে সাংবাদিকরা জানিয়েছেন। মে মাসে কয়েকটি প্রচার মাধ্যমের সম্পাদকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ প্রয়োগের অভিযোগ তোলেন। ইংরেজি দৈনিক নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবির জানান, সশস্ত্র বাহিনীর একটি গোয়েন্দা বিভাগ পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলের সম্পাদকদের এই মর্মে নির্দেশ দেয়া শুরু করেন যে কোন্ কোন্ সংবাদ প্রকাশ করা যাবে এবং কোন্ কোন্ সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।

সরকারি মালিকানাধীনে আছে একটি বেতার এবং একটি টেলিভিশন কেন্দ্র।

দেশে ১০টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন কেন্দ্র এবং ৩টি বেসরকারি বেতার কেন্দ্র চালু ছিল। এছাড়া বিদেশ ভিত্তিক এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত দুইটি টেলিভিশন কেন্ত্র ছিল যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ খবর প্রচার করেছে। কেবল অপারেটররা সাধারণভাবে সরকারের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের কাজকর্ম চালিয়েছেন; তবে শুল্ক না দেয়ার অভিযোগে সরকার অপারেটরদেরকে কয়েকটি আন্তর্জাতিক চ্যানেলের প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য করে। সব প্রাইভেট চ্যানেলকে পূর্ব নির্ধারিত শর্তানুযায়ী বিনা পয়সায় নির্দিষ্ট কিছু সরকারি খবর এবং প্রধান উপদেষ্টা বা রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রচার করতে হয়েছিল।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধ করা সিএসবি নামের ২৪ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেল টেলিভিশন কেন্দ্রটি বছরের শেষ নাগাদও বন্ধ ছিল। (প্রচারের লাইসেন্সের কাগজপত্রে জালিয়াতির অভিযোগে সরকার এই কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়েছিল)।

সাংবাদিকদের ওপর হামলা সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হয়রানি, গ্রেফতার ও মারধরের শিকার সাংবাদিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকারের হিসাব মতে আলোচ্য বছরে ৩৮ জন সাংবাদিক আহত, ৪ জন গ্রেফতার, ২৫ জন মারপিটের শিকার হন এবং ৩০ জনকে হুমকি প্রদান করা হয়। এছাড়া ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কয়েকজন সাংবাদিক এবং কয়েকটি মানবাধিকার এনজিও জানায়, সাংবাদিকরা সংবাদ প্রচারে স্ব-উদ্যোগী হয়ে সংযমী ছিলেন ।

সাংবাদিকদের ওপর চালিত হয়রানির মধ্যে রয়েছে:

'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস'-এর মতে ২৮শে মার্চ সাদা পোশাকধারী পুলিশ দূর্গাপুরে সাংবাদিক রবিউল ইসলামকে আটক করে তার ওপর নির্যাতন চালায়। রবিউল রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক সানশাইন পত্রিকার রিপোর্টার। তিনি তার পত্রিকায় দূর্গাপুর থানা পুলিশের দুর্নীতির খবর প্রকাশ করেছিলেন। পুলিশ রবিউলকে ১২ ঘণ্টা আটকে রাখে, তাকে মারধর করে এবং ছেড়ে দেয়ার আগে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করে।

ডেইলি স্টার পত্রিকা ও মানবাধিকার সংস্থা অধিকার জানায়, স্থানীয় একটি কারাগারে হয়রানির ঘটনার খোঁজ-খবর তদন্ত করতে গেলে কারারক্ষীরা ডেইলি স্টারের সংবাদদাতা মীর্জা শাকিলকে মারধর করে। কারারক্ষীরা বন্দিদের দেখতে আসা লোকদের কাছ থেকে জোর করে টাকা পয়সা নিচ্ছেন - এই ছবি তুলতে গেলে ১২ জন কারারক্ষী তার ওপর হামরা চালায় এবং তাকে সেখান থেকে বের করে দেয়। স্থানীয় সাংবাদিকরা দ্রুত তাকে উদ্ধারে যান এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করান। তার বুক, পিঠ এবং ঘাড়ে মারাত্মক জখম ছিল।

স্থানীয় পুলিশের যৌন হয়রানি ও ঘুষের খবর প্রকাশ করার পর মে মাসে পুলিশ ইসানুর রহমানের ওপর অত্যাচার চালায়। এতে তার হাত-পা ভেঙ্গে যায়। সরকার এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

২০০৭ সালের আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা: ওই বছরের জানুয়ারি মাসে অধ্যাপক আনিসুর রহমানের ওপর হামলা; ফোকাস বাংলার সাংবাদিক শফিকুল ইসলামের ওপর ২০০৬ সালের হামলা; কিংবা ২০০৬ সালে পানছড়ি প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং সমকাল পত্রিকার সংবাদদাতা এস চাঙমা সত্যজিৎকে গুলি করে হত্যার ঘটনার তদন্তের কোন অগ্রগতি হয়নি।

সাংবাদিক, সম্পাদক ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানা যায়, জরুরি অবস্থার অধীনে প্রচার মাধ্যমের ওপর চাপ অব্যাহত থাকে। ডিজিএফআই কর্মকর্তারা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের ওপর নজরদারি অব্যাহত রাখে এবং সরকার ও সামরিক বাহিনীর কাছে আপত্তিকর মনে হলে সে সংবাদ প্রচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়। ঢাকার অনেক সম্পাদক ও সাংবাদিক জানান যে, ডিজিএফআই সদর দফতরে তাদের ডেকে নিয়ে নানা প্রশ্ন করা হয় এবং সরকার ও সামরিক বাহিনী সম্পর্কে ইতিবাচক খবর প্রচারে উৎসাহ দেয়া হয়।

অধিকার ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, রাজশাহীতে র‍্যাব ইউনিটের হাতে একটি বিচার বহির্ভূত হতাকাণ্ডের খবর প্রকাশ করার পর র‍্যাবের কথায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশকে জাহাঙ্গীর আলম আকাশ নামের স্থানীয় এক প্রখ্যাত সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীকে চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। জাহাঙ্গীরের ভাষ্য মতে তার এক মাসের কারাবন্দি জীবনে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। নভেম্বর মাসে জামিনে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

জুলাই মাসে যায়যায়দিন পত্রিকার সম্পাদককে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়, কেননা তিনি তার পত্রিকায় সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমদের একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করেছিলেন।

ডেইলি স্টার পত্রিকার সাবেক সাংবাদিক এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের গবেষক তাসনীম খলীল এখনও সুইডেনে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। ২০০৭ সালের মে মাসে যৌথ বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতনের পর থেকে তিনি প্রবাসে রয়েছেন।

সরকার বিদেশী প্রকাশনা পর্যালোচনা এবং চলচ্চিত্র সেন্সর করেছে। সরকার পরিচালিত একটি সেন্সর বোর্ড দেশী ও বিদেশী চলচ্চিত্র পর্যালোচনা করেছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দান, অশীলতা, বিদেশের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে বা কারো মানহানি ঘটতে পারে - তেমন কাহিনী কিংবা ফিল্মের কাহিনী নকল হলে এই বোর্ড তা সেন্সর করার বা প্রদর্শন বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। ভিডিও ও ডিভিডি দোকানগুলোয় নানা ধরনের ভিডিও ও ডিভিডি পাওয়া গেছে। এই দোকানগুলোর চলচ্চিত্রের ওপর সরকারি সেন্সর আরোপের চেষ্টা বিচ্ছিন্ন ও অকার্যকরভাবে হয়েছে।

কুরুচিপূর্ণ বা অশীল ছবি, ইসলামকে অবমাননা বা বিরূপভাবে উপস্থাপন হয়েছে ধারণা হয় এমন উক্তি বা চলচ্চিত্র এবং জাতীয় নেতাদের সম্পর্কে আপত্তিকর উক্তির ক্ষেত্রে সরকার প্রায়শই সেন্সর আরোপ করেছে।

ইসলাম ধর্মের প্রতি কথিত অবমাননার অভিযোগে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রথম আলো পত্রিকার সাপ্তাহিক ব্যঙ্গ ম্যাগাজিন আলপিনের ব্যাপারেও কোন অগ্রগতি হয়নি।

বাক স্বাধীনতা খর্ব করার ক্ষেত্রে সরকার মানহানির অভিযোগের আশ্রয় নিয়েছে; তবে ২০০৮ সালে এই সংখ্যা কমে গেছে।

যুগান্তর পত্রিকার বিরুদ্ধে এমএএইচ সেলিমের দায়ের করা মামনহানির মামলারও কোন অগ্রগতি হয়নি।

ইন্টারনেট ব্যবহারের স্বাধীনতা

সাধারণভাবে দেখা যায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইন্টারনেটের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মতামত স্বাধীনভাবেই প্রকাশ করতে পেরেছেন; যদিও মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছে যে, সরকার ইন্টারনেট যোগাযোগের ওপর নজরদারি করে থাকেন। রিপোর্টার উইদাউট বর্ডার নামক একটি সংগঠন দাবি করে যে, পুলিশ সাংবাদিকদের ই-মেইলের ওপর নজরদারি করেছে। এছাড়াও যৌথ বাহিনী যেসব সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতাকে আটক করেছিল তারা জানিয়েছেন যে, তাদের ই-মেইল লগ-অন এং পাসওয়ার্ড জোর করে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

শিক্ষার স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করার স্বাধীনতা

সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের স্বাধীনতা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি করার স্বাধীনতা খর্ব করেনি। তবে সংবেদনশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াদির ওপর গবেষণা কাজ নিরুৎসাহিত করেছেন।

খ. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি করার অধিকার

জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় সভা-সাবেশ করা এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার খর্ব করা হয় এবং ঘরোয়া ও প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ১২ই মে সরকার সারা দেশে ঘরোয়া রাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কতিপয় ধারা শিথিল করে; কিন্তু এ সব বৈঠকে কতজন যোগ দিতে পারবেন তার সংখ্যা বেঁধে দেয় এবং বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণের শর্ত আরোপ করে। ৪ঠা আগস্ট ১১টি পৌরসভায় পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে সেখানে সরকারের অনুমতিক্রমে সভা ও মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়। সরকার সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় ঘরোয়া সমাবেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তবে কতজন এ ধরনের সমাবেশে যোগ দিতে পারবেন তার একটা সংখ্যা বেঁধে দেয় এবং এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠানের আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। ডিসেম্বরের সংসদীয় নির্বাচন সামনে রেখে সরকার ৩রা নভেম্বর রাজনৈতিক সভা-সমাবেশের ওপরকার নিষেধাজ্ঞা আরো শিথিল করে এবং ১৭ই ডিসেম্বর তা পুরাপুরি প্রত্যাহার করে।

এই নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়ন সমানভাবে হয়নি। যেমন, নবগঠিত সরকারপন্থী দল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টির (পিডিপি) সভাপতি ফেরদৌস আহমদ কোরেশী এপ্রিল ও মে মাসে প্রকাশ্যে দলীয় সভা করেন। এসব সভার খবর প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার হলেও এবং জরুরি অবস্থার মধ্যে এ ধরনের সভা করা যায় কি না সে নিয়ে সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন উত্থাপন করা হলেও সরকার এই দলের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সরকার ১১ সেপ্টেম্বর আটক বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় এবং তাকে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় খুলতে অনুমতি দেয়।

সমাবেশ করার স্বাধীনতা

আলোচ্য বছরের বেশির ভাগ সময়ে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার কারণে সমাবেশ ও রাজনৈতিক সভার ওপর বিধিনিষেধ ছিল। তবে দেখা গেছে কারখানার শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা পূর্ব ঘোষণা ছাড়াও রাস্তায় বিক্ষোভ করেছেন।

২১শে আগস্ট ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোটের একটি পরিকল্পিত মিছিল বাতিল করে। বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার বড় ছেলে তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে চার দলীয় জোট মিছিল করে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যেতে চেয়েছিল। জোটের সমর্থকরা সমাবেশের জন্য মানিক মিয়া এভিনিউতে সমবেত হলে পুলিশ লাঠি চার্জ করে তাদের হঠিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ২৭শে আগস্ট বিএনপি জোট ঘোষণা করে, পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদে জোট সারা দেশে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করবে। পুলিশ ঢাকা ও অন্যান্য শহরের কয়েকটি স্থানে এই মানব বন্ধন ভেঙ্গে দেয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কোথাও কোথাও পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

সংগঠন করার স্বাধীনতা

নৈতিকতা ও জনশৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ" সাপেক্ষে আইনে প্রত্যেক ব্যক্তির সংঘবদ্ধ হবার অধিকারের কথা বলা আছে। সরকার সাধারণভাবে এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা মাফিক পছন্দের সংগঠনে বা সমিতিতে যোগ দিতে পেরেছেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে জরুরি অবস্থা জারি করা হলে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল সরকার সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখে তা শিথিল করে। শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলোকে খুব সীমিত আকারে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি দেয়া হয়। এতে সর্বোচ্চ ৫০০ লোকের সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয়। তবে শর্ত দেয়া হয়, এই সমাবেশ ঘরোয়া হতে হবে এবং শুধুমাত্র শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই কেবল আলোচনা করা যাবে। এই নিষেধাজ্ঞা এবং পরবর্তীতে এর প্রত্যাহার রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলোকে (ইপিজেড) কোন ভাবে প্রভাবিত করেনি। কেননা, ইপিজেড-এর জন্য রয়েছে ভিন্ন আইন। সেখনে শুধু "শ্রমিক সংঘ" করার অনুমতি রয়েছে। আলোচ্য বছরে শ্রমিক সংঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখ জরুরি অবস্থার পুরোপুরি প্রত্যাহার হলে ট্রেড ইউনিয়নগুলো স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড শুরু করার সুযোগ লাভ করে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়েছে এবং আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সরকার বাস্তবেও এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছে। সরকার ধর্মনিরপেক্ষ হলেও কিছু কিছু ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলও রয়েছে। সরকার ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান ছিল এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সরকারি চাকুরি, রাজনৈতিক পদ এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাস্তবে পিছিয়ে ছিলেন।

শরি'য়া বা ইসলামি আইন আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি বা অ-মুসলমানদের ওপর চাপিয়েও দেওয়া হয়নি, তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক বিষয়ে শরি'য়ার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিয়ে, নিবন্ধিত বিয়ের তালাক ইত্যাদি বিষয় মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশে বর্ণিত রয়েছে। একজন মুসলমান পুরুষ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন, তবে এক্ষেত্রে সংশিষ্ট পুরুষটিকে পরবর্তী স্ত্রী গ্রহণ করার পূর্বে আগের স্ত্রীর লিখিত অনুমতি নিতে হয়। সমাজ বহুবিবাহের ঘোর বিরোধী এবং বহু বিবাহের ঘটনাও ঘটেছে খুবই কদাচিৎ।

বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং দত্তকগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে সংশিষ্ট ব্যক্তির ধর্মের ভিত্তিতে সামান্য পার্থক্য ছিল। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর জন্য আলাদা পারিবারিক আইন ছিল। হিন্দু পারিবারিক আইনে বহুবিবাহের বিধান রয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদ বা আইনগতভাবে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক থাকার কোন বৈধ বিধান না থাকলেও, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিয়ে করার অধিকার এই আইনে বলা রয়েছে। আন্তঃধর্মীয় বিয়ের ব্যাপারেও কোন আইনগত বিধিনিষেধ ছিল না।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতি সরকারের সুরক্ষা অব্যাহত ছিল। তবে সামজিক বৈষম্যও অব্যাহত ছিল। আহমদীয়া প্রকাশনার ওপর আরোপিত সরকারি নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্ট স্থগিত রেখেছে। ফলে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের প্রকাশনা কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখতে পেরেছেন।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত এ বছরেও সরকার ১৯৬৫ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধের পর গ্রহণ করা হিন্দুদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়।

বিদেশী ধর্মীয় মিশনগুলোকে বাংলাদেশে কাজ করতে দেয়া হয়েছে। তবে তাদের ধর্মান্তরকরণের অধিকার প্রকাশ্য আইনী সুরক্ষা পায়নি। বিদেশী মিশনারিদেরকে তাদের নিজ নিজ ভিসা প্রতিবছর নবায়ন করে নিতে হয়। কোন কোন মিশনারি ভিসা প্রাপ্তি ও নবায়নের বেলায় সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন বলে জানান। কোন কোন বিদেশী মিশনারি জানান, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী তাদের কর্মকাণ্ড ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সরকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে তাদের নিজ নিজ উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা, ধর্মগুরুদের প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় সফর এবং বিদেশের সম-ধর্মীয় বোর্ডগুলোর সাথে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দিয়েছে। আইন নাগরিকদের ধর্মান্তরিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

সামাজিক অপব্যবহার ও বৈষম্য

এ বছরে আহমদীয়া, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বৈষম্যের ঘটনা ঘটেছে। তবে এই সময়ে আহমদীয়া বিরোধী কোন বিক্ষোভ সমাবেশ হয়নি।

১৫ই ও ২১শে মার্চ গোয়েন্দা পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীয়াদের ধর্মীয় সম্মেলন করতে দেয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে অবশ্য উভয় সমাবেশই অনুষ্ঠিত হয়।

সংখ্যালঘু লোকদের ওপর হামলার খবর পাওয়া গেছে। যদিও এসব ঘটনা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং এসব হামলার পেছনে অপরাধমূলক, রাজনৈতিক না ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল- তা নিরূপণ করা যায়নি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানায়, ২রা এপ্রিল র‍্যাব ও পুলিশের কর্মকর্তারা জয়পুরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমান চন্দ্র বসাককে তার গ্রামের বাড়িতে বেদম প্রহার করে। একজন মুসলমান প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাসের চেষ্টার মামলা দায়ের করার পর তার ওপর এই হামলা চালানো হয় বলে আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানায়।

ক্রিশ্চিয়ান লাইফ বাংলাদেশ (সিএলবি) জানায়, ১২ই এপ্রিল রাঙ্গুনিয়ায় দুই জন খ্রিস্টান ব্যক্তি যখন আর্সেনিক দূষণ, বাল্য বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যার ওপর চলচ্চিত্র প্রদর্শন করছিলেন, তখন একদল ইসলামপন্থী লোক তাদের ওপর হামলা চালায়।

ঢাকার মিরপুর এলাকায় সেনানিবাস সংলগ্ন ভূমি থেকে ১২০টি হিন্দু পরিবারকে সামরিক বাহিনী উচ্ছেদের চেষ্টা করছিল বলে আগে যে খবর পাওয়া গিয়েছিল এ বছরও সে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বলে কোন খবর পাওয়া যায়নি। সামরিক বাহিনী ১৯৬১ সালের ভূমি ক্রয় চুক্তির ভিত্তিতে এই উচ্ছেদ চেষ্টা আগে চালিয়েছিল- যা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা হয়। বছর শেষেও মামলাটি বিচারাধীন ছিল।

২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে মৌলভীবাজারের ক্যাথলিক খাসিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেন, মনছড়া বনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বন বিভাগের লোকেরা তাদের হয়রানি করছে। মনছড়া বনে অনেক খাসিয়া পরিবার বাস করেন। এই বন সরকারের বন বিভাগের অধীন। খাসিয়া নেতারা জানান, বন বিভাগের

কয়েকজন কর্মকর্তা তাদের লোকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ক্যাথলিক মিশন প্রধানসহ তাদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে খাসিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং কুলাউড়া উপজেলা কর্মকর্তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সরকার এই মর্মে খাসিয়াদের ওয়াদা করেন যে, বন বিভাগের জায়গা দখল না করলে খাসিয়াদের হয়রানি করা হবে না। বন বিভাগ তার নিজস্ব জায়গা দখলের অভিযোগে পরে আবার খাসিয়াদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দায়ের করে। মধুপুরে স্থানীয় বন বিভাগের লোকেরা গারো সম্প্রদায়ের লোকদের হয়রানি করেছেন। ২০০৭ সালে এই দুই এলাকায় কর্মরত বন বিভাগের কয়েকজনকে পুলিশ দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আগের বছরের তুলনায় এর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তবে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের হয়রানি অব্যাহত রয়েছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সরকারি চাকুরি ও রাজনৈতিক পদ চাওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন। সরকারি চাকুরির প্রার্থী বাছাই বোর্ডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব প্রায়শই ছিল না।

বাংলাদেশে কোন ইহুদি সম্প্রদায় নেই এবং স্থানীয়দের বিরুদ্ধে ইহুদি বিরোধী কর্মকাণ্ডের কোন খবর পাওয়া যায়নি। তবে কিছু কিছু পত্রিকায় মাঝে মাঝে ইহুদি বিরোধী প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য ২০০৮ সালের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা রিপোর্টটি পড়ুন। এটির ওয়েব ঠিকানা: www.state.gov/g/drl/irf/rpt.

ঘ. চলাফেরার স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, শরণার্থীদের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি

আইন এসব অধিকার দিয়েছে। সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম ছাড়া সরকার এসব আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় আওতায় সরকার চলাফেরার স্বাধীনতা খর্ব করার কর্তৃত্ব দিয়েছিলো। সন্দেহভাজন অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সরকার দেশত্যাগ করতে দেননি। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরা অনেককে ঢাকা বিমানবন্দর ত্যাগ করতে দেননি। কেননা তাদের নাম সন্দেহভাজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকায় ছিল।

আইনে কাউকে নির্বাসনে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা নেই এবং এই ব্যবস্থার কোন প্রয়োগও হয়নি। বাংলাদেশের পাসপোর্টে ইসরাইল ভ্রমণ অনুমোদন করে না।

শরণার্থীদের সুরক্ষা

শরণার্থীদের মর্যাদা সংক্রান্ত ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ কনভেনশন কিংবা ১৯৬৭ সালের জাতিসংঘ প্রটোকল অনুযায়ী শরণার্থীদের রাজনৈতিক আশ্রয় বা শরণার্থীদের মর্যাদা দানের নিয়ম বাংলাদেশের আইনে নেই। সরকার শরণার্থীদের সুরক্ষা প্রদানে কোন ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেনি। কিন্তু যেসব শরণার্থীদের দেশে ফিরে গেলে জীবন বা স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে, সরকার তাদেরকে বাস্তবে বহিষ্কার করেনি বা প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করেনি এবং কিছু সুরক্ষা প্রদান করেছে।

বার্মা থেকে নতুন করে আসা রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশ রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে অব্যাহতভাবেই অস্বীকৃতি জানায়। সরকার এসব শরণার্থীদেরকে অবৈধ অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের যতজনকে সম্ভব সীমান্ত থেকেই আবার বার্মায় ফেরত পাঠিয়েছে। এই সীমান্তের বেশির ভাগ এলাকাই এমন যে তা দিয়ে

লোকজন সহজে এপর-ওপার আসা-যাওয়া করতে পারে এবং এ কারণে শরণার্থীদের ঢল ঠেকানো অকার্যকর প্রমাণিত হয়। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের (ইউএনএইচসিআর) মতে, এভাবে যাদের ফেরত পাঠানো হয়েছে তাদের কেউ কেউ শরণার্থীর মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। সরকারিভাবে বার্মায় ফেরত পাঠানোর পর কিছু ব্যক্তি অবৈধভাবে আবার ফিরে এসে শিবিরে অবস্থানরত তাদের তালিকাভুক্ত আত্মীয়দের সাথে বসবাস করেছেন এবং তাদের খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছেন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে শিবিরের কর্মকর্তারা এসব অনিবন্ধিত ব্যক্তিদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন আর পুলিশ তাদের বিদেশী নাগরিক আইনে আটক করেছেন। বছরের শেষ নাগাদ কক্সবাজার এলাকার বিভিন্ন জেলে ৮৮জন এ ধরনের রোহিঙ্গা বন্দি ছিলেন। এদের মধ্যে ৪ জনের সাজা হয়েছে এবং ৮৪ জন আটক রয়েছেন। বছরের শেষ নাগাদ ৩৮৫ জন শরণার্থী জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। ইউএনএইচসিআর-এর মতে এই সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম বলে মনে হয়। কেননা অনিবন্ধিত শরণার্থীর সংখ্যা অনেক এবং অন্য কারাগারে যারা রয়েছেন তারা তাদের আটক থাকার বিষয়টি জানাননি।

ইউএনএইচসিআর-এর সহযোগিতায় সরকার দু'টি সরকারি শরণার্থী শিবিরে অবস্থানরত ২৮ হাজার তালিকাভুক্ত শরণার্থীকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিরাপত্তা দিয়েছে। এছাড়া যেসব রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীকে ইউএনএইচসিআর সাক্ষাৎকার নিয়ে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, সরকার তাদেরও অস্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এই এলাকায় কর্মরত আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো জানায়, কক্সবাজার ও টেকনাফের আশেপাশের এলাকায় স্থানীয় জনগণের সাথে আরো প্রায় দুই থেকে পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করেন, অথচ এরা শরণার্থী হিসাবে সরকারিভাবে স্বীকৃত নন। এদের মধ্যে ১০ হাজার রোহিঙ্গা বাস করেন একটি অলিখিত শিবিরে। আলোচ্য সময়ে রোহিঙ্গাদের বার্মায় ফেরত পাঠনো হয়নি।

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোর পয়ঃনিষ্কাশন, পুষ্টিমান এবং বাসস্থানের মান আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিচে নেমে গেছে বলে সাম্প্রতিক সময়ের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ইউএনএইচসিআর-এর সঙ্গে এসব শিবিরের মান উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। সরকার ইউএনএইচসিআরকে শিবিরের কিছু ঘর ও শৌচাগার মেরামত করতে দিয়েছে এবং আরো অধিক সংখ্যক এনজিওকে শরণার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণদান এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে।

ইউএনএইচসিআরের মতে, রোহিঙ্গাদেরকে ধর্ষণ, মারধর, গৃহ নির্যাতন, খাদ্য রেশন থেকে বঞ্চিত করা, যথেচ্ছ আটক রাখার এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যোগাড় করার সমস্যার মত অনেক ঘটনা এবারও ঘটেছে। তবে এবছর এ ধরনের কম সংখ্যক ঘটনার কথা জানা গিয়েছে।

আগের বছরগুলোর মত সরকার এবছরও বার্মায় ফিরতে অপারগ রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে স্থানীয়ভাবে কাজ করা, চিকিৎসার বা লেখাপড়ার সুযোগ দিতে ইউএনএইচসিআরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। সরকার চায় বার্মায় ফেরত না যাওয়া পর্যন্ত সকল রোহিঙ্গা শিবিরেই বসবাস করবে। সরকারের দাবি রোহিঙ্গারা কাছে টাকা পয়সা রাখতে পারবে না এবং কারো কাছে টাকা পয়সা পাওয়া গেলে তা যে কোন সময় বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। তবে বাস্তবে এই বিধানের প্রয়োগ বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অনেক শরণার্থী দেশের অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে অবৈধভাবে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছেন এবং অনেকে রিকশা চালিয়েছেন এবং সামান্য সংখ্যক শিক্ষার্থী গৃহশিক্ষকের সহায়তায় লেখাপড়া করেছে এবং দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত স্কুল পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

একটি স্ব-নির্ভর কর্মসূচির আওতায় এসব শরণার্থীদেরকে সাময়িকভাবে বসবাস করার এবং চলাফেরার স্বাধীনতা দিতে ইউএনএইচসিআরের একটি প্রস্তাব সরকার মানেননি বলে জানা গেছে।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি

১৮ই মে হাইকোর্ট বাংলাদেশে বসবাসকারী বিহারীদের এদেশের নাগরিক বলে ঘোষণা দেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় যে এক লক্ষ ৬০ হাজার থেকে দুই লক্ষ অ-বাঙ্গালি বিহারি মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলেন, তারা দেশের বিভিন্ন শিবিরে রয়েছেন। রিফিউজি ইন্টারন্যাশনালের মতে, এদের অনেকেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেন এবং তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার সুযোগও খুব সীমিত। কোন কোন বিহারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ না করে পাকিস্তানে চলে যাবার অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এসব বিহারিকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল। ১৯৭১ সালের পর জন্ম নেয়া আটকে পড়া এসব বিহারির অনেকে বাংলাভাষী পরিবেশের সাথে মিশে গেছেন।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে যে, যেসব বিহারি বাংলদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য তারা ভোটার হতে এবং ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। শতকরা প্রায় ৮০ শতাংশ, অর্থাৎ এক লক্ষ ৮৪ হাজার প্রাপ্ত বয়স্ক বিহারি ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন।

সেকশন ৩: রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা: নাগরিকদের সরকার পরিবর্তন করার অধিকার

শান্তিপূর্ণ উপায়ে নাগরিকদের নিজ সরকার পরিবর্তন করার অধিকারের কথা সংবিধানে স্বীকৃত। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনে জনগণ অংশগ্রহণ করেছে। এসব নির্বাচনে অবশ্য সহিংসতার ঘটনাও বেশ ঘটেছে।

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ইয়াজুদ্দীন আহম্মেদ বিরাজমান রাজনৈতিক সহিংসতা এবং ২২শে জানুয়ারি, ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে জানুয়ারি মাসে সারাদেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দেন। তাদের ওপর নির্বাচনী সংস্কার, বিশেষ করে একটি নতুন, পক্ষপাতহীন, সঠিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালের জুন মাসে ছবিসহ আট কোটি ১০ লক্ষ ভোটারের তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে ৯ই জুলাইয়ের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষ করে। ২২শে মে দেয়া এক রুলিংয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি হাইকোর্ট প্যানেল এই মতামত দেয় যে, সংসদ ভেঙ্গে যাবার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে নির্বাচন কমিশন সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। আদালত অবশ্য ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

সরকার ১৯শে আগস্ট গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধনী), ২০০৮, প্রকাশ করে। রাজনীতিতে দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে এই সংশোধনীতে ১৯৭২ সাল থেকে প্রচলিত নির্বাচনী আইনে ব্যাপক সংস্কার আনা হয়। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো নতুন অধ্যাদেশের কিছু ধারাকে অ-গণতান্ত্রিক বলে মনে করে। যেমন, রাজনৈতিক দলের ছাত্র, মহিলা ও বৈদেশিক শাখা বিলুপ্ত করার বিধান। নতুন বিধি অনুযায়ী একজন প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র

জমা দেয়ার সময় তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পদের পরিমাণ, তার বিরুদ্ধে কোন মামলা রয়েছে কি না সে সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যও তাদের তহবিলের উৎস ও ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন কমিশনে দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা ৩৪৫ জন। এদের মধ্যে ৩০০ জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত, অবশিষ্ট ৪৫ জন হচ্ছেন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য যাদের মনোনয়ন দেয় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে প্রাপ্ত তাদের মোট আসনের অনুপাতে। দলীয় নেতারা দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন দেন, এবং অভিযোগ রয়েছে যে বিত্তবান প্রার্থীরা দলের জন্য মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে বা নেতাদের উপঢৌকন দিয়ে মনোনয়ন কিনতে পারেন।

নির্বাচন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেন ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে। ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বিজয়ের পর খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ২০০১ সালের সে নির্বাচনে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সহিংসতা ও অনিয়মের ঘটনা ঘটেছিল। নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী ঐক্যজোটকে নিয়ে বিএনপি একটি চার দলীয় জোট সরকার গঠন করে। তবে রাজনীতির মাঠে বিএনপি এবং বিরোধী আওয়ামী লীগই ছিল প্রধান ভূমিকায়। বছর শেষে খালেদা জিয়া এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয় তবে উভয়ের বিরুদ্ধেই এখনও মামলা রয়েছে। ২০শে সেপ্টেম্বরে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ ঘোষণা করেন, পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৮ই ডিসেম্বর এবং উপজেলা নির্বাচন ২৪শে ও ২৮শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ৩রা ডিসেম্বর এক আপোস রফায় নির্বাচন কমিশন ২৯শে ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচন এবং ২২ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্মত হয়।

পূর্ববর্তী সংসদে ৭ জন মহিলা সরাসরি ভোটে নির্বাচত হয়েছিলেন। মন্ত্রীর পদমর্যাদা পেয়েছিলেন তিন জন: খালেদা জিয়া, তার বোন (প্রয়াত, তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন) এবং শেখ হাসিনা। বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের ৭৬ জন বিচারকের মধ্যে ৩ জন নারী।

সংখ্যালঘুদের জন্য সংসদে পৃথক আসনের কোন বিধান ছিল না। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি ১০.৩ শতাংশ সংখ্যালঘু, কিন্তু সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে তিন শতাংশেরও কম।

সরকারের দুর্নীতি ও স্বচ্ছতা

সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফৌজদারি সাজার আইন রয়েছে। তবে সরকার এই আইন কার্যকারভাবে প্রয়োগ করেনি। সরকারি কর্মকর্তারা প্রায়শই শাস্তির উর্দ্ধে থেকে দুর্নীতিতে জড়িত হয়। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সামরিক বাহিনী সরকারের দুর্নীতি দমনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়। এই সরকার একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধানকে (দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা) দুর্নীতি দমন কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেয়, দুর্নীতি তদন্তে সরকারি ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রয়াসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য দুর্নীতি বিরোধী একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করে এবং এই কমিটির কাজে সহায়তা করার জন্য কয়েকটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে।

আদালত টাস্ক ফোর্সের হাতে ২০০৭ সালে আটক সন্দেহভাজন বড় মাপের দুই শতাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে ১৫৮ জনকে মুক্তি দেন। এদের মধ্যে ছিলেন সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া। এই দুই জনের বিরুদ্ধেই তাদের নিজ নিজ সরকারের আমলে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ আনা হয়। ১১ই জুন এক নির্বাহী আদেশে সরকার বিদেশে চিকিৎসার জন্য শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেয়। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্ট খালেদা জিয়াকে জামিন দেয়।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় সরকার বড় বড় ব্যবসায়ী নেতাদের আটক করে। এই আইন সরকারকে যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষমতা দিয়েছে। আটক এসব ব্যক্তির বেশিরভাগকেই পরে প্রচলিত দুর্নীতি দমন আইনের আওতায় বিচার করা হয়। বড় মাপের আটক ব্যক্তিদের মামলাগুলো আনা হয় বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায়। ফলে আটককৃত সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা বিচার চলাকালে জামিন বা আপিলের আবেদন করতে পারেন নি। সুপ্রিম কোর্ট এক রুলিংয়ের মাধ্যমে তার কিছু জামিন এখতিয়ার পুনর্বহাল করে এবং জামিন আবেদন বিবেচনায় তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে।

অনেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির মুক্তিলাভের ঘটনাকে সুশীল সমাজের কেউ কেউ সমালোচনা করে বলেন, সরকার দুর্নীতি দমনে আন্তরিক নয়। এর প্রেক্ষিতে সরকার জানায়, কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জামিনে ছেড়ে দেয়া হলেও সরকার এবং দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি বিরোধী মামলাগুলো অব্যাহত রাখবে।

সরকার ১লা সেপ্টেম্বর এক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ জারি করে এই কমিশন বলবৎ করেন। তিন সদস্যের এই কমিশনে নাম সুপারিশ করার জন্য পরে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতিকে প্রধান করে ছয় সদস্যেরে একটি বাছাই কমিটি গঠন করে। রাষ্ট্রপতি ১৯শে নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরীকে এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন। তিনি এই কমিশনের অপর দুই সদস্যও নিয়োগ দেন।

২০শে সেপ্টেম্বর উপদেষ্টা পরিষদ তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ অনুমোদন করে। এই অধ্যাদেশ সরকারি গোপনীয়তা আইনের স্থলাভিষিক্ত হয়। গোপনীয়তা আইন দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাদের রক্ষায় সহায়ক ছিল।

সেকশন ৪: মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথিত অভিযোগের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি তদন্তের ব্যাপারে সরকারের মনোভাব

অনেক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন সরকারি বিধিনিষেধ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের তদন্ত কাজ চালিয়েছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সম্পর্কে তাদের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো এসব প্রতিবেদনে প্রায়শ সরকারের কঠোর সমালোচনা করলেও, তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় সংযমী হওয়ার নীতিও অনুসরণ করেছে।

সরকার ধর্মীয় সংগঠনসহ সকল এনজিওকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক করেছিল। সরকার দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সামরিক বাহিনী এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ড আরো জোরদার নজরদারিতে আনে। কিছু স্থানীয় এনজিও দুর্নীতিতে জড়িত বলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ অভিযোগ করে।

অধিকার জানায়, র‍্যাব ৩ ব্যাটালিয়নের একজন মেজর অধিকারের পরিচালকের সাথে বৈঠকে বসার অনুরোধ করেন। কি কারণে তিনি এই বৈঠকে বসতে চান তা জানাননি। অধিকার তার কার্যালয়ে এই বৈঠকে বসতে রাজী হয়; কিন্তু তিনি এই বৈঠকে যোগ দিতে আসেন নি এবং পরে এর কোন কারণও ব্যাখ্যা করেননি।

প্রধানমন্ত্রীর (বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টার) কার্যালয়ের আওতাধীন এনজিও ব্যুরো এনজিওর প্রকল্প অনুমোদন করে থাকে। ব্যুরো এনজিওগুলোর নির্বাচন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রকল্প অনুমোদনদানে বিলম্ব করেছে। বছরের শেষ নাগাদও অধিকারের নিবন্ধনের আবেদনটি এনজিও ব্যুরোয় পড়ে ছিল।

বছরের শেষ নাগাদ আসাদুল্লাহ আল গালিবকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। তবে তার বিরুদ্ধে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও ব্রাকের মত কয়েকটি এনজিও'র বেশ কয়েকটি স্থানীয় কার্যালয়ে ২০০৫ সালে হামলা চালানোর অভিযোগের বিচার এখনও চলছে। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ইসলামি সংগঠন আহলে হাদিসের এই নেতার বিরুদ্ধে ২০০৫ সালে গ্রামীণ ও ব্রাক অফিসে বোমা হামলা এবং কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে বোমা হামলার লক্ষ্যবস্তু করে বলে অভিযোগ আনে। বছরের শেষ নাগাদও মামলাগুলো চলছিল। তবে পুলিশ ১০টির মধ্যে ৪টি মামলার অভিযোগ তুলে নিয়েছেন।

সেকশন ৫: বৈষম্য, সামাজিক নিগ্রহ ও মানব পাচার

বৈষম্যমূলক আচরণ আইনে নিষিদ্ধ; তবে সরকার বৈষম্য দূরীকরণের আইন বাস্তবায়নে শক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। নারী, শিশু, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়শ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

নারী

আইনে নারীর প্রতি কয়েক ধরনের বৈষম্য করা যাবে না বলে সুনির্দিষ্টভাবে উলেখ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংস আচরণের জন্য বিশেষ পদ্ধতির বিচার ব্যবস্থা এবং কঠোরতর শাস্তির বিধান এবং সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংস আচরণের ঘটনার তদন্তকারী কর্মকর্তার অবহেলা এবং ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার জন্য রয়েছে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান। তবে এসব আইনের প্রয়োগ ছিল দর্বল। ২০০৩ সালের জাতীয় সংসদ বর্তমান নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের সংশোধনী আনে, এতে যৌতুকের জন্য সংঘটিত অপরাধের বিচারের বিধান কিছুটা শিথিল করা হয়। এই সংশোধনীতে সম্মান বা সম্ভ্রম হানির কারণে নারী আত্মহত্যা করলে তার শাস্তির বিষয়টিও নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আইনে ধর্ষণ ও স্বামী-স্ত্রী কর্তৃক শারীরিক নিগ্রহ নিষিদ্ধ। কিন্তু দম্পতির মধ্যেকার ধর্ষণের ব্যাপারে কোন আইনী বিধান নেই। অধিকার জানায়, এ বছর ৪৫৪টি ধর্ষণের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে যার মধ্যে ২০২টি ঘটনা ঘটেছে নারীর বিরুদ্ধে এবং ২৫২টি ঘটনা ঘটেছে শিশুর বিরুদ্ধে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানায় যে, ধর্ষণের মোট ঘটনা এই হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি হবে। কেননা, সামাজিক অমর্যাদার ভয়ে ধর্ষণের শিকার অনেক নারী ঘটনা চেপে যান। ধর্ষণকারীদের বিচার সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে হয়নি।

পারিবারিক সহিংসতা ব্যাপক মাত্রায় ছিল, যদিও নারী নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন ছিল। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৫০ শতাংশ নারী কমপক্ষে একবার নিজ সংসারে সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি জানায়, আলোচ্য বছরে ৬২২টি পারিবারিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এসব নির্যাতনের কিছু ঘটনা যৌতুক নিয়ে বিরোধের কারণে ঘটেছে। এ সময়ে যৌতুকের কারণে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে দেশে ঘটেছে ১৮৮টি যৌতুক সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ড; যদিও অন্যান্য এনজিওর মতে এই সংখ্যা হবে ৩০০ থেকে ৫০০-র মত। পারিবারিক নির্যাতন ফৌজদারি ব্যবস্থায় আসেনি।

১২ বছর বয়সী বাড়ির কাজের মেয়েকে ধর্ষণ করার অভিযোগে ব্যবসায়ী তাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালে দায়ের করা মামলার কোন অগ্রগতি হয়নি। প্রতিবেশীরা তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর থেকে তাজুল পলাতক এবং এখন পর্যন্ত ধরাও পড়েনি।

নারীর পতিতাবৃত্তি আইনে সিদ্ধ, কিন্তু পুরুষদের জন্য এই পেশা নিষিদ্ধ। তবে স্থানীয় এনজিওগুলো জানায়, বিশেষ করে বড় বড় শহরে পুরুষদের পতিতাবৃত্তি ছিল। নারীর পতিতাবৃত্তি গ্রহণের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে বলে যে বিধান রয়েছে সেটা সাধারণত: কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করেছে এবং এক্ষেত্রে প্রায়শই বয়সের ভুয়া সনদ ব্যবহার করা হয়। পতিতাবৃত্তির জন্য যারা কমবয়সী মেয়েদের সংগ্রহ করে তাদের বিরুদ্ধে সরকার খুব কমই আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে। এই পেশায় নিয়োজিত অপরিণত বয়স্ক মেয়েদের বেশিরভাগই কাজ করে বিভিন্ন পতিতালয়ে। স্থানীয় এনজিওগুলোর হিসাব মতে দেশে প্রায় এক লাখ মহিলা এই পেশায় রয়েছেন। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) ২০০৪ সালে এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করে যে ১০ হাজার অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বাণিজ্যিকভাবে পতিতাবৃত্তির কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হিসাবে এই সংখ্যা ২৯ হাজার বলে বলা হয়েছে। দেশের ভেতরে ও বাইরে নারী পাচারের ঘটনা সমস্যা হিসেবেই ছিল।

বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির মত কয়েকটি এনজিও হতদরিদ্র ব্যক্তি, দুস্থ নারী ও শিশুদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র চালায়। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা জানায়, নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদেরকে আর কারাগারে থাকতে হয় না। আদালত এ ধরনের নারী-শিশুর বেশিরভাগকেই আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়েছে। সামান্য যে কয়জনকেও বা জেলে পাঠানো হয়েছে তাদের পাঠনো হয়েছে অন্যত্র সরানোর আগে স্বল্প সময় অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য।

২০০১ সালে দেয়া হাইকোর্টের এক আদেশে ফতোয়া নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলামি রেওয়াজ অনুযায়ী কেবল মুফতি বা ইসলাম ধর্মীয় আইনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই ফতোয়া দেয়ার কর্তৃত্ব রাখেন। তবে দেখা গেছে যে, গ্রামের মৌলভিরা কখনও কখনও কোন বিষয়ে তাদের মতামত দিয়ে সেগুলোকে ফতোয়া বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এ ধরনের ফতোয়ার ঘটনা বেশিরভাগই ঘটেছে নারীর বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে এবং এ ধরনের ফতোয়ার কারণে আইন বহির্ভূত সাজা হতে পারে।

নারীর বিরুদ্ধে আইন হাতে তুলে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে। মৌলভিরা কখনও কখনও নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে এমন ঘটনার সৃষ্টি করেছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে ২০০৮ সালে নারীর বিরুদ্ধে ২০টি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার মধ্যে ছিল দোররা মারা, হিলা বা বাধ্যতামূলক বিয়ে, সমাজ থেকে একঘরে করা এবং অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন। এসিড আক্রমণের ঘটনা একটি মারাত্মক সমস্যা ছিল। নারীর ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে এবং পুরুষের ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনাও বেড়েছে। এসব আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চেহারা বিকৃত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা অন্ধ হয়ে গেছেন। স্বামী বা স্ত্রীর একে অন্যের প্রতি

অবিশ্বস্ত থাকার অভিযোগে এসব আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। অধিকারের হিসাব মতে, এবছর সারা দেশে ১৩৩ ব্যক্তি এসিড আক্রমণের শিকার হয়েছেন, এর মধ্যে ৭৩ জন নারী, ৩৪ জন পুরুষ এবং ২৬ টি শিশু।

আইন সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সংগ্রহ করা পত্র-পত্রিকার খবরে দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার এক পর্যায়ে দক্ষিণ কালিকাপুরের দুই সন্তানের জননী মাহমুদাকে তার স্বামী মৌখিকভাবে তালাক দেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষ হলেও একজন মাদ্রাসা শিক্ষকসহ স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ঘোষণা দেন, মাহমুদার তালাক হয়ে গেছে এবং অন্য এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর তাকে তালাক দিয়েই কেবল আসল স্বামীকে সে আবার বিয়ে করতে পারবেন। মাহমুদা হিল্লা নামে পরিচিত বিয়ের এই ব্যবস্থা মানতে অস্বীকার করলে স্থানীয় সমাজ তাকে সপরিবারে একঘরে করে এবং গ্রাম থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়।

এসিড নিক্ষেপের মামলা বিশেষ আদালতে দ্রুততর বিচারের বিধান রয়েছে এবং এই আইন সাধারণত জামিন অনুমোদন করে না। ২০০০ সালে প্রণীত নারী ও শিশু নির্যাতন নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য ছিল এসিডের প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণ করে নারীর বিরুদ্ধে এসিড সন্ত্রাস কমানো। সচেতনতার অভাব এবং দুর্বল প্রয়োগের কারণে এই আইনের সফলতা সীমিত ছিল। বিশেষ ট্রাইবুনালগুলো পুরোপুরি কার্যকর না থাকলেও এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের হিসাব মতে, এসব ট্রাইবুনাল ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪৪৪ ব্যক্তিকে এসিড আক্রমনেণর দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এর মধ্যে আলোচ্য ২০০৮ সালে ২১৬ জনকে ট্রাইবুনালে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

সমাজে মহিলারা একটি অধঃস্তন অবস্থানে ছিলেন এবং তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। গতদশকে পুরুষদের চেয়ে নারীর চাকুরির সুযোগ যথেষ্ট হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূলে রয়েছে দেশের রফতানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প। তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই নারী। নারী ও পুরুষের মজুরির হার মোটামুটি এক ছিল।

৮ই মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান একটি নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ছিল সংসদের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সম্পদে মহিলাদের অধিকতর হিস্যা প্রাপ্তি। তবে কয়েকটি ইসলামি গোষ্ঠী যুক্তি দেখায় যে, উত্তরাধিকার হিসাবে নারী ও পুরুষের সমান সম্পদ প্রাপ্তির অধিকার শরিয়া আইন এবং প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনের পরিপন্থী। সরকারের উপদেষ্টারা এই অভিযোগ প্রকাশ্যে অস্বীকার করলেও সরকার এই নীতি পর্যালোচনার জন্য আলেম-ওলামাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটি এই নীতি পরিবর্তনের সুপারিশ করে। সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য দাবি করেন যে, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির মত অন্যান্য কিছু উপায়ে নারী উন্নয়ন নীতিমালার কয়েকটি উপাদান বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

শিশু

সরকার স্থানীয় ও বিদেশী এনজিওদের সহায়তায় শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করেছে। এসব যৌথ প্রয়াসের ফলে দেশের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা খাতে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তবে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বলেছে, দেশের মোট শিশুর প্রায় অর্ধেক মারাত্মক অপুষ্টির শিকার।

দেশের আইন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। তবে এর বাস্তবায়নে কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ পিতামাতারাই কিছু কিছু ছেলেমেয়েকে শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে রেখেছেন। এসব পিতামাতা চান তাদের শিশুরা কাজ করে পরিবারে আর্থিক সাহায্য করুক নয়ত নিজের বাড়ির কাজ দেখুক। গরিব পরিবারের শিশুদের স্কুলে পাঠনোর জন্য ওইসব পরিবারের জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোয় ভর্তির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। এসব প্রয়াস সত্ত্বেও সরকারি স্কুলগুলো নানা ধরনের ফি আদায় করে যা গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং এসব পরিবারের ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে নিরুৎসাহিত করে।

শুধুমাত্র শিশুদের জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল আছে সামান্য সংখ্যক, তবে সরকারি হাসপাতালগুলোয় ছেলে ও মেয়ে সব শিশুই চিকিৎসার সমান সুযোগ পেয়েছে।

বিয়ের আইনগত বয়স মেয়েদের বেলায় ১৮ এবং ছেলেদের বেলায় ২১ বছর হলেও অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার ব্যাপক সমস্যা রয়েই গেছে। কম বয়সে ঠিক কত বিয়ে হয় সে সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কারণ বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে এবং বয়স যাচাইয়ের জন্য জন্ম নিবন্ধন মোটামুটি ১০ শতাংশ লোকের কাছে কেবল পৌঁছেছে। ম্যাস লাইন মিডিয়া নামের স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংস্থা ২০০৪ সালে এক জরিপ চালিয়ে দেখতে পায়, সম্পন্ন হওয়া বিয়ের শতকরা ৪০ ভাগকেই বাল্যবিবাহ বলা চলে। বাল্যবিবাহ রোধের উদ্দেশ্যে সরকার যে সব বাবা-মা তাদের মেয়ের লেখাপড়া অন্তত ১৮ বছর পর্যন্ত চালিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করেন সেসব ছাত্রীর লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহনের জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব করেছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিসংখ্যান মতে, ৪৭টি শিশু অপহৃত, ১৫৪ নিহত, ৩৮৮ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতায় আহত, ১১৫ ধর্ষণের ও ১৫ এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়। এছাড়া ৩৯৪টি শিশু নিখোঁজ হয়।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে শিশু পরিত্যাগ, শিশু অপহরণ এবং পাচারের ঘটনা একটি মারাত্মক ও ব্যাপক সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও শিশু পাচারের ঘটনা সমস্যা হিসাবেই থেকে গেছে।

কোন কোন শিল্পে শিশুশ্রমও একটি সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে। তাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, বিশেষ করে বাসা-বাড়িতে কর্মরত শিশু শ্রমিকরা তাদের মনিবদের হাতে মারধরের শিকার হয়েছে। তাদের প্রতি কখনও কখনও দাসের মত আচরণ করা হয়েছে, আবার পতিতাবৃত্তিতে ব্যবহারের জন্য কখনও কখনও তাদেরকে বিদেশে পাচার করার ঘটনাও ঘটেছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ওই বছর বাসাবাড়ির কাজে নিয়োজিত শিশুদের মৃত্যু, জখম এবং যৌন আক্রমণের যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তার ৫০ ভাগ ঘটেছে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের কারণে।

মানব পাচার

মানব পাচার আইনে নিষিদ্ধ। তবে নারী, শিশু ও পুরুষ পাচারের ঘটনা একটি মারাত্মক সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে। "অনৈতিক ও অবৈধ কাজের উদ্দেশ্যে" শিশু পাচারের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে এবং সরকার পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিয়েছে। আলোচ্য

বছর নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী বিশেষ আদালতে ৩০টি মামলার বিচার হয়েছে। আদালত ৩২ ব্যক্তিকে সাজা দিয়েছে; এর মধ্যে ২২ জনকে দেয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

পাচারকৃত নারী, পুরুষ ও শিশুদের ভারত, পাকিস্তান, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং দেশের অভ্যন্তরে নানা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজের সন্ধানে মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মত দেশে যাওয়া অনেক বাংলাদেশী সেখানে গিয়ে বাধ্যতামূলক শ্রমদানের মত শোষণমূলক পরিস্থিতিতে পড়েছেন; তাদের চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ ছিল এবং তাদের অনেকে ভয়-ভীতির এবং দৈহিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। বাণিজ্যিকভাবে পতিতাবৃত্তিতে ব্যবহারের জন্য নারী ও শিশুদেরকে পাচার করে দেশের ভেতরেই বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়েছে। অনুরূপভাবে পোশাক ও মৎস্য শিল্পে কিছু শিশু প্রায় কৃতদাসের মত পরিস্থিতিতে কাজ করেছে এবং দেশের নানা স্থানে অনেক সময় গোটা পরিবার এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছে।

সরকারি সূত্র থেকে জানা যায়, আলোচ্য বছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকেরা পাচারকৃত ১৬৪ ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃতদের কেউ কেউ সরকার বা এনজিও পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে ছিল। এনজিওগুলো যখন তাদের বাবা-মার সন্ধান করছিল, তখন আশ্রয়কেন্দ্রে তাদের সামাজিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আলোচ্য বছর বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি দেশের ভেতরেই পাচারকৃত ২৩২ জনকে উদ্ধার করেছে এবং আরো ৫৪৫ জনকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। মানব পাচারের দায়ে ঠিক কতজনকে আটক করা হয়েছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুশকিল, কেননা অনেক সময় পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বৈধ অনুমতি ছাড়া সীমান্ত অতিক্রম করার মত অপেক্ষাকৃত লঘু অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেন্টার ফর উইমেন এন্ড চাইল্ড সার্ভিসেস-এর মতে, পাচার হওয়া বেশির ভাগ ছেলের বয়স ছিল ১০ বছরের নিচে, অন্যদিকে পাচার হওয়া মেয়েদের বয়স ছিল ১১ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে।

পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। ভাল চাকুরি বা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বেশিরভাগকে পাচার করা হয়। পাচারকৃত অনেককে দেশের ভেতরে ও বাইরে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কাজ করিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে । চরম দারিদ্রের কারণেও নিজ সন্তানকে বাইরে পঠিয়েছেন অনেক বাবা-মা। স্বামী পরিত্যক্ত মহিলা, এতিম এবং পারিবারিক সমর্থনহীন ব্যক্তিরা পাচারের শিকার বেশি হন। বিদেশে বসবাসকারী আদম পাচারকারীরা অনেক সময় কোন গ্রামে এসে সেখানকার কোন মহিলাকে বিয়ে করেছে, কিন্তু পরে কাঙ্ক্ষিত দেশে পৌঁছার পর ওই মহিলাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। ওইসব মহিলাকে পরে বাধ্যতামূলক শ্রমদান, কায়িক শ্রম বা পতিতাবৃত্তির জন্য বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। অপরাধী চক্রও অনেক পাচার ঘটনার সাথে জড়িত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, বিশেষ করে যশোর, বেনাপোল এলাকা, তেমন নিয়ন্ত্রিত নয়। ফলে, এসব সীমান্ত পথে অবৈধভাবে মানুষের পারাপার অনেকটা সহজ রয়ে গেছে।

১০ হাজারের বেশি শিশুকে পতিতাবৃত্তির জন্য পতিতালয়গুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এদের পাচারকারীদের শাস্তি খুব কম হয়েছে।

সরকারের দুর্নীতিও মানব পাচার প্রক্রিয়াকে অনেকটা সহজ করেছে। যৌনকাজে ব্যবহারের জন্য নারী ও শিশু পাচারের বিষয়টি পুলিশ অনেক সময় উপেক্ষা করেছে এবং পতিতালয়ের মালিক ও দালালরা পুলিশকে ঘুষ দিয়ে সহজে পাচারকাজ চালিয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অধিকহারে শ্রমিক যাওয়ার কারণে বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর ব্যবসা বেশ আকর্ষণীয় রয়ে গেছে। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কোন কোন সময় শ্রমিকদের ভুয়া চাকুরি বা শর্তাবলির আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু বিদেশে গিয়ে এসব শ্রমিক আটকা পড়েছেন। শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান প্রায়শ শ্রমিকদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত টাকা-পয়সা নেয়, যা শ্রমিকদেরকে বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং ঋণের বেড়াজালে আটকে ফেলে। বিদেশের গন্তব্যে পৌঁছার পর অনেক মহিলাকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। বিদেশ গমনেচ্ছু শ্রমিকদের প্রতারণা করার দায়ে সরকার এবছর শ্রমিক প্রেরণকারী ১১টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। এর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য বা উর্দ্ধতন রাজনীতিবিদ। জালিয়াতি ও চুক্তি ভঙ্গের দায়ে সরকার ৭টি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সাময়িকভাবে স্থগিত করে এবং ৬ টির জামানত বাজেয়াপ্ত করে। ২০০৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় শ্রমিক পাঠানোর সময় রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলোর ভূমিকা পুরোপুরি তুলে দিয়ে শ্রমিক পাঠানোর দায়িত্ব সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে সরকার রাজি হয়। বাংলাদেশী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বারবার সমস্যা হওয়ার পর ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে মালয়েশিয়া সরকার ঘোষণা করে যে, তারা বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ আপাতত বন্ধ রাখবে।

সম্পদের অভাবে তদন্ত কাজে ব্যাঘাত ঘটলেও সরকার দেশের মোট ৬৪টি জেলার সবকটিতেই মানব পাচার বিরোধী পুলিশ ইউনিট চালু রেখেছে যাতে পাচারকৃত ব্যক্তিরা পাচারকারী সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে উৎসাহিত হন এবং মানব পাচার সংক্রান্ত আরো তথ্য যোগাড় করা যায়। পুলিশ এবং সংশিষ্ট সরকারি আইনজীবীদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রেক্ষাপটে সরকারি আইনজীবীদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণদানের জন্য আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে এবং জাতীয় পুলিশ একাডেমির জন্য মানব পাচার বিরোধী কোর্স চালু করতে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সাথে সরকার কাজ করে।

মানব পাচার রোধে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত ছিল। পুলিশের সদর দফতরে মানব পাচার নজরদারি সেলের মাধ্যমে সরকার মানব পাচার মামলাগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে মানব পাচার পরিস্থিতি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির বৈঠক। এই সেল পুলিশের মানব পাচার বিরোধী তৎপরতার ওপর নজরদারি করেছে এবং সেই সাথে সংশিষ্ট মামলাগুলোর নিষ্পত্তিতে সহায়তা করেছে। জেলা পর্যায়েও সরকারের মানব পাচার বিরোধী নজরদারি কমিটি রয়েছে। সংশিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ হচ্ছেন এসব কমিটির প্রধান। দেশের ৬৪টি জেলাতেই এই কমিটি আছে। কমিটিগুলো প্রতি মাসে ঢাকায় পাঠানো তাদের মাসিক রিপোর্টে মানব পাচার বিরোধী গ্রেফতার, দণ্ডাদেশ, খালাস এবং পাচার হওয়া কতজন লোককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, ইত্যাদির অগ্রগতি উল্লেখ করে।

সরকারের পররাষ্ট্র, বৈদেশিক কল্যাণ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক অভিবাসন দফতর ও দাতাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে শ্রমিক পাচার ও অভিবাসন সমস্যা মোকাবিলায় একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে। ২০০৭ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে অবস্থিত সকল বাংলাদেশ দূতাবাসের কনসুলার শাখার লোকদের বিদেশেই পাচারের ঘটনাগুলো নিষ্পত্তি করার নতুন নির্দেশাবলি জারি করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য শ্রমিক পাচার বিষয়ে একটি কোর্সও চালু করা হয়েছে। আলোচ্য বছরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৫ জন কর্মকর্তা মানব পাচারের শিকারদের রক্ষা করার সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এছাড়াও ১২ জন লেবার অ্যাটাশে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার এবং গন্তব্য রাষ্ট্র নিয়োগ চুক্তির শর্তাবলি মানছেন কি না তা মনিটর করার জন্য প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় যে, আলোচ্য বছরে মানব পাচারের দায়ে ১৭৮ ব্যক্তিকে আটক করা হয় এবং ৩৭টি পাচার মামলার নিষ্পত্তি করা হয়। এসব মামলায় ৪৩ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় যার মধ্যে ৩২ জনকে দেয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মানব পাচারের সাজায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকলেও আলোচ্য বছরে কোন পাচারকারীকে এই দণ্ড দেয়া হয়নি। সরকার নারী ও শিশু পাচারের বিষয়টির ওপর অব্যাহতভাবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। মানব পাচার বন্ধে সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল পাচারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা, এর কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে গবেষণা চালানো, পাচার বিরোধী প্রচারণা এবং পাচারকৃতদের উদ্ধার ও পুনর্বাসন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব পাচার বিষয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের মধ্যকার সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য পাচার বিরোধী এনজিওগুলোর সাথে প্রতি মাসে বৈঠক করেছেন। এই সমস্যা মোকাবিলা ও রোধ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এই মন্ত্রণালয় এবছর এনজিও ও মানব পাচার বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে হাত মিলিয়ে প্রচারাভিযান নীতি-কৌশল জোরদার করেছে। মানব পাচারের সংজ্ঞা আরো পরিষ্কার করেছে এবং সেই সাথে মানব পাচার বিরোধী আদালত এবং মানব পাচারের বিরুদ্ধে প্রচলিত দেশী ও বিদেশী আইন তুলে ধরেছে। এই মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে মানব পাচার বিরোধী একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেছে।

সরকার, এনজিও এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায় ২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৯৯ জন উটের জকিকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং এদের ১৯৮ জনই নিজ নিজ পিতামাতার কাছে ফিরে গেছে। সরকার ও এনজিওগুলো দেশে ফিরিয়ে আনা উটের জকিদের প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন ও পরিবারে ও সমাজে তাদের আত্মীকরণের বিষয়টির ওপর নজরদারি অব্যাহত রেখেছে। উটের জকিরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে মোট ১ লাখ ৪ হাজার টাকা পেয়েছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফের সহায়তায় সরকার উটের জকি পুনর্বাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের জন্য একটি কর্ম প্রকল্প তৈরি করেছে। এই প্রকল্প কম্যুনিটি কেয়ার গ্রুপগুলোর টিকে থাকা এবং ফিরে আসা জকিদের জীবিকার নিশ্চয়তার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

অনেক এনজিও, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার নেতারা পাচারবিরোধী তৎপরতা চালিয়েছেন। তারা পাচার রোধ, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা, সমর্থন সংগ্রহ, পাচার আইনের প্রয়োগ, উদ্ধার ও পুনর্বাসন, আইনের সংস্কার, প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাথে সংশিষ্ট থেকেছেন। গ্রাম পর্যায়ে জন্ম ও বিয়ের দলিলপত্র না থাকার মত কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানব পাচার বিরোধী মামলার বিচার হয়েছে। পাচারকৃতদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের আসন বৃদ্ধির এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের মত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজে টেকসইভাবে আত্মীকৃত হতে তাদের সহায়তা করার বিষয়টিতেও সাফল্য ছিল সীমিত।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক মানব পাচার প্রতিবেদনটি এই ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে:
www.state.gov/g/tip

প্রতিবন্ধী

আইনে প্রতিবন্ধীদের সমান আচরণ পাওয়ার এবং অধিকার ভোগ করার কথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। আইনে প্রতিবন্ধিতা রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ,

চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন ও চাকুরি, যানবাহন ব্যবহারের সুযোগ ও প্রচারের সুযোগ লাভের অধিকারের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত। মানসিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসাদানের সরকারি সুযোগ সীমিত। তাদের চিকিৎসা সেবাদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদান ও কর্মসংস্থানের জন্য আলোচ্য বছরে কয়েকটি বেসরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান ছিল।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

আদিবাসীরা নিজেদের ভূমি ব্যবহারের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে খুব কম প্রভাব ফেলতে পেরেছেন । ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি খুব সামান্য। ভূমির ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর কর্তৃত্ব ছাড়তে সরকার নারাজ ছিলেন- যদিও শান্তি চুক্তিতে এসব বিষয় পাহাড়িদের ওপর ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় অসন্তোষের পাশাপাশি শান্তি-শৃঙ্খলার সমস্যা এবং কথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমস্যাও রয়ে গেছে।

সরকার তিন পার্বত্য জেলাকে সীমিত আকারে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় এনেছেন। নিরাপত্তার কারণে সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে ব্যাখ্যা দিলেও মানবাধিকার সংগঠনগুলো ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তারা দাবি করেন, পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে সরকার এমনটা করেছে। জমিজমা নিয়ে পাহাড়ি ও বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালিদের মধ্যকার সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব ভূমি কমিশনের হলেও জটিল ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তিতে এই কমিশন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। বিদ্রোহী তৎপরতার সময় ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়া পাহাড়িদের পুনর্বাসনে সরকারি সহায়তার অভাবে পাহাড়ি নেতারা ক্ষুব্ধ। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করে যে, নিরাপত্তা বাহিনী দেশে জারি করা জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে উপজাতীয় লোকদের যথেচ্ছ গ্রেফতার করাসহ অধিকহারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

সরকার ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি এলাকা থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর ১৬টি অস্থায়ী শিবির গুটিয়ে নেয়। ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকে সরকার এ পর্যন্ত ২১২ টি ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়েছে। আরো প্রায় ২৭০ টি ক্যাম্প এই এলাকায় রয়ে যায়। সরকার আর কোন ক্যাম্প সরিয়ে নেয়নি।

১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি বা পিসিজেএসএস-এর সাথে এই চুক্তির বিরোধিতাকারী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টের (ইউপিডিএফ) ও সরকারের বিরোধ অব্যাহত ছিল। ২০০৭ সালে ইউপিডিএফের হাতে নিহত ভিক্ষু কুমার চাকমা নামের পিসিজেএসএস-এর এক যুব কর্মীর হত্যাকাণ্ডের তদন্তেও কোন অগ্রগতি নেই।

উপজাতীয় সংগঠনগুলো অভিযোগ করে আসছে যে, নিরাপত্তা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠির ওপর নিগ্রহ অব্যাহত রেখেছে। খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতে ভূমি নিয়ে যে বিরোধ হয় সে ব্যাপারেও কোন অগ্রগতি হয়নি।

পিসিজেএসএস ও অন্যান্য আদিবাসী নেতারা অভিযোগ করেন যে, সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ বহিনীর সদস্যরা জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে আদিবাসী লোকদের ওপর গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দায়ের, ইত্যাদি "দমনমূলক

তৎপরতা" বৃদ্ধি করেছেন। তারা জানান, দেশে জরুরি অবস্থা থাকার কারণে লোকজন এসব কাজের প্রতিবাদ করতে পারেননি।

২০০৭ সালের মার্চ মাসে যৌথ বাহিনীর সদস্যদের হাতে আটক ইউপিডিএফের সদস্য বিমল বিকাশ চাকমা ও মিলন বিহারি চাকমার ঘটনারও কোন অগ্রগতি হয়নি।

অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতীয় লোকজনও বাঙ্গালি মুসলমানদের হাতে তাদের সম্পত্তি হারানোর কথা বলেছেন। মৌলভিবাজার ও মধুপুরের বনাঞ্চলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে বসবাস করা ভূমিতে সরকার জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠার প্রকল্প অব্যাহত রেখেছেন। তাছাড়া, আদিবাসী সম্প্রদায়, স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা এবং গীর্জাগুলো দাবি করেছে যে, বনবিভাগের লোকেরা আদিবাসী অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যে হাজার হাজার মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে সেগুলো এখনও প্রত্যাহার করেনি।

অন্যান্য সামাজিক নিগ্রহ ও বৈষম্যমূলক আচরণ

সমকামিতা ছিল অবৈধ। তবে বাস্তবে এই আইনের প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

সমকামী পুরুষদের সহায়তার জন্য কয়েকটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক আছে, তবে সমকামী নারীদের সহায়তাদানের কোন সংগঠন বিরল।

সমকামীদের ওপর আক্রমণের ঘটনার খোঁজ-খবর রাখা কঠিন, কেননা ঘটনার শিকার ব্যক্তিরা পরিচয় প্রকাশ করতে চান না । সমকামিতা নিয়ে সামাজিক লজ্জা রয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামায় না। দেশে সমকামিতার ওপর গবেষণা হয়নি বলেই বলা চলে।

এইচআইভি/এইডস রোগীদের ওপর সহিংসতা বা বৈষম্যের খবর জানা যায়নি। এর জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন করার মানসিকতা এবং দেশে এই ধরনের রোগীর সংখ্যা খুব কম থাকায় এ সংক্রান্ত গবেষণার অভাবকে দায়ী করেছে এনজিওগুলো।

সেকশন ৬: শ্রমিকের অধিকার

ক. সংঘবদ্ধ হবার অধিকার

আইনে শ্রমিকদের কোন সংঘে বা সমিতিতে যোগ দেওয়ার এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে সংঘ গঠন করার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। দেশের রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেডগুলোয় বলবৎ রয়েছে পৃথক শ্রম আইন। তবে বাস্তবে সরকার সবসময় শ্রমিকদের এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলো না। জরুরি অবস্থা জারি করার পর থেকে শ্রমিকদেরকে বৈধভাবে বৈঠক করতে দেয়া হয়নি এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ছিল। অধিকন্তু, এবছর কয়েকজন শ্রমিক নেতা এবং শ্রমিক সংগঠন জানিয়েছেন যে, তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছে এবং নিরাপত্তা বাহিনী কোন কোন শ্রমিক সংগঠনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেছে। সেপ্টেম্বর মাসে সরকার জরুরি ক্ষমতা বিধানের কয়েকটি ধারা শিথিল করে কিছু শ্রমিক ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি দেয় এবং পরে এই আইন পুরাপুরি তুলে নিলে সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড চালু হয়। এই ব্যবস্থা ইউনিয়ন গঠন এবং

নিবন্ধন করার সীমাবদ্ধতার ওপর খুব সামান্যই প্রভাব ফেলেছে; এবং ইপিজেডে শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব এবং কল্যাণ কমিটি গঠনের যে অনুমোদন রয়েছে তাতেও কোন প্রভাব ফেলেনি।

বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তি প্রায় মোট ৫ কোটি। এর মধ্যে মাত্র ১৯ লাখ বিভিন্ন সমিতিভুক্ত এবং এসব সমিতির অনেকগুলো আবার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের বিশাল অনানুষ্ঠানিক খাত - যাতে বেশিরভাগ (প্রায় ৮০ শতাংশ) মানুষ নিয়োজিত- তার বিশ্বাসযোগ্য শ্রমিক পরিসংখ্যান ছিল না।

ইপিজেডগুলোতে শ্রম আইনের সামগ্রিক প্রয়োগ অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। শুধু ইপিজেড সম্পর্কিত শ্রম আইনে "শ্রমিক সমিতি" নামে ইউনিয়ন করার অনুমতি আছে। এসব সমিতির রয়েছে মালিক পক্ষের সাথে তাদের স্বার্থ নিয়ে যৌথ দেন দরবার করার অনুমতি। এই আইন ২০০৬ সাল থেকে ইপিজেডে শ্রমিক কল্যাণ কমিটি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরে দ্বি-স্তরীয় প্রক্রিয়ায় শ্রমিক সমিতি করা যাবে যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে সমিতিবদ্ধ হওয়ার বা শ্রমিক ইউনিয়ন করার পূর্ণ অধিকার। এখানকার অনেকগুলো সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত নয়। বিভিন্ন শ্রমিক গ্রুপ জানায়, ইপিজেডগুলোর ৬০ শতাংশ কারখানায় শ্রমিক সমিতি বা সংঘ রয়েছে।

ইপিজেডের যে সব কারখানা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, মানেনি শ্রমিকরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। কিন্তু আদালত এসব মামলার কোন নিষ্পত্তি এখনও দেয়নি। আইন অনুযায়ী একটি কারখানায় তিনটির বেশি শ্রমিক সংগঠন এক সাথে কার্যকর থাকতে পারে না। বাংলাদেশ শ্রম আইনের সংশোধন করে ৪ঠা মে সরকার ঘোষণা করেন, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা একসাথে অবস্থিত কোন গ্রুপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বা তার ২০০ গজের মধ্যে কোন ট্রেড ইউনিয়ন অফিস খোলা যাবে না। ওই সংশোধনী বাস্তবায়নের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে এ ধরনের অফিস গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে ২৫ টি পৃথক শ্রম আইনকে এক করে একটি ব্যাপকভিত্তিক আইন করা হয়েছে। একজন শ্রম পরিচালক ইউনিয়নের নিবন্ধন দেয়ার ও তা বাতিল করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। আলোচ্য বছরে প্রধানত শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে কয়েকটি ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। নিবন্ধন বাতিল বা নিবন্ধন না দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার ইউনিয়নগুলোর রয়েছে।

ইউনিয়নের ৭৫ ভাগ সদস্য রাজি হলে ধর্মঘট করার অধিকারের কথা এই আইনে স্বীকার করা হয়েছে। বাস্তবে এসব নিয়ম মেনে ধর্মঘট করার ঘটনা ঘটেছে খুব কম। শ্রমিকদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে, আবার কখনও কখনও গুজবের ভিত্তিতে সহসাই এ ধরনের ধর্মঘট বা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে আপোষরফা, সালিশী এবং শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। নতুন এই আইনে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। কোন বিরোধে সমাধানে পৌঁছা না গেলে সে ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ধর্মঘটে যাওয়ার অধিকার রাখেন। যদি কোন ধর্মঘট ৩০ দিন বা তার চেয়েও বেশি (জন নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থের বেলায় আরো কম) চলে তাহলে সরকার ধর্মঘট বন্ধ করে দিয়ে বা তা নিষিদ্ধ করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে পাঠাতে পারবেন। তবে, যেহেতু বেশিরভাগ ধর্মঘট আইন বহির্ভূতভাবেই ঘটে থাকে সে জন্য এসব ধর্মঘটের মেয়াদ হ্রাসে সরকার তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে নাই। সরকার অবশ্য সম্পত্তির ধ্বংসসাধন, সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কিংবা জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে কোন কোন শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি ক্ষেত্রে আপিল আদালত ধর্মঘটিদের খালাস দিয়েছে।

ইপিজেড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অ্যাক্ট নামের একটি ভিন্ন আইনে দেশের ইপিজেডগুলোয় শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকারের বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে; যদিও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ তাদের এলাকায় বাংলাদেশ শ্রম আইনের ব্যাপকতর প্রয়োগের স্বীকৃতি দেন না। বাংলাদেশ শ্রম আইন এখানকার শ্রমিকদেরকে সমিতি করার অধিকারের বাইরেও অন্যান্য শ্রমিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইপিজেড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী ২০০৬ সাল থেকে শ্রমিকদেরকে ধর্মঘট করার আইনগত অধিকারসহ শ্রমিক সংগঠন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষ এক বিধান অনুযায়ী আলোচ্য ২০০৮ সালের শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট নিষিদ্ধ রাখা হয়েছিল এবং ধর্মঘটের পরিবর্তে বাধ্যতামূলক সালিশীর কথা বলা হয়েছে। এই আইনের বিধানে যৌথ দরকষাকষির অধিকার স্বীকার করা হয়েছে তবে ইপিজেডের বাইরের কোন শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে সংশিষ্ট হবার কোন বিধান রাখা হয়নি।

ইউনিয়নগুলো ছিল রাজনীতির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। পাট, বস্ত্র, রসায়ন শিল্পসহ রাষ্ট্রায়ত্ব কল-কারখানায় এবং সরকার-পরিচালিত চট্টগ্রাম বন্দরে এদের দাপট ছিল সবচেয়ে বেশি।

সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা ও নিরাপত্তা বাহিনীতে কর্মরত ব্যক্তিদের ইউনিয়ন করার অধিকার আইনে নেই। ইতিপূর্বে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার ওপর বিধিনিষেধ ছিল। তবে বাস্তবে দেখা গেছে, অনেক শিক্ষক পুরাতন অনেক পেশাদার সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছেন। ২০০৬ সালের আইনে শিক্ষক ও এনজিও কর্মীদের মত কিছু নতুন পেশার লোকদের ইউনিয়ন গঠন করার অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। জরুরি আইন চলাকালে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার অনেক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রণীত এই নতুন আইন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা যায়নি। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ বিমান পরিবহন ও সমুদ্রগামী জাহাজে কর্মরত লোকজনের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

খ. সংগঠিত হবার ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার

কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই শ্রমিকদের সংগঠিত হবার এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকারের কথা বাংলাদেশ শ্রম আইনে রয়েছে। তবে এই আইন সবসময় কার্যকরভাবে বলবৎ করা হয় নাই। এই আইনে শ্রমিক কর্মকাণ্ড সংগঠনে মালিকের হস্তক্ষেপ রোধের বিধান আছে। সব বিধানের প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে হয় নাই এবং বেসরকারি খাতের অনেক প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন তৎপরতা সক্রিয়ভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। কোন কোন নিয়োগকর্তা ইউনিয়ন গঠন তৎপরতা বা ইউনয়ন প্রক্রিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল সন্দেহে কাউকে কাউকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেছে, ইউনিয়ন তৎপরতার খোঁজ-খবর গোপনে রাখার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রম এলাকায় লোক নিয়োগ করা হয়েছে, আবার কখনও কখনও বা কোন কোন শ্রমিককে এ ব্যাপারে সহিংসতার ভয় দেখানো হয়েছে।

শ্রম পরিচালক ইপিজেডের বাইরের ইউনিয়ন গঠন সংক্রান্ত বৈষম্যের অভিযোগের বিষয়ে রায় দিয়েছেন। শ্রম আদালত সারাবছর ইউনিয়ন করার দায়ে চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকুরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছে; কিন্তু মামলার জট রয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে এ ধরনের মামলার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা চাকুরিতে পুনর্ববহাল দাবি করার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের অর্থ চেয়েছে। আলোচ্য বছরে এ ধরনের মামলা হয়েছে ৩২৯টি। এর মধ্যে ১০ থেকে ১৫ জন কেবল চাকুরিতে ফিরতে চেয়েছেন। আরো অধিক সংখ্যক শ্রম বিরোধ শ্রম আদালতে শুনানির আগেই অনানুষ্ঠানিকভাবে মিটিয়ে ফেলা হচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী বৈধভাবে নিবন্ধিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলো মালিকপক্ষের সাথে যৌথ দরকষাকষি করতে পারে। এই আইন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণের পন্থাটি সহজ করেছে এবং এই প্রক্রিয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো জানায়, কোন কোন কোম্পানিতে পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ভয়ে শ্রমিকরা তাদের এই অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থেকেছেন।

ইপিজেড কর্মকর্তারা সংকীর্ণভাবে এসব বিধান এবং প্রয়োগযোগ্য বিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, দেশের ইপিজেডগুলো বাংলাদেশ শ্রম আইনের ব্যাপক আওতার বাইরে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন তাদের এই ধারণা চ্যালেঞ্জ করে। যেমন, ইপিজেডগুলো তাদের এলাকায় শ্রমিক প্রতিনিধি ও কল্যাণ কমিটির (ডবিউআরডবিউসি)সদস্যদেরকে অন্য কারখানার অনুরূপ কমিটির সদস্যদের সাথে বৈঠক করতে দেয় নি। কারখানার ব্যবস্থাপকরা বাইরের শ্রমিক নেতাদের সাথে তাদের কারখানার শ্রমিকদের বৈঠক কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং ওই হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্যকারী শ্রমিকদেরকে চাকুরিচ্যুত করেন। বছরের শেষ নাগাদও ইপিজেড কর্মকর্তাদের এসব দাবির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ অব্যাহত ছিল।

আইন অনুযায়ী নিজ নিজ কারখানার মালিকরা ডবিউআরডব্লিউসির শ্রমিকদের কারণ দর্শিয়ে বরখাস্ত বা বা কারণ না দর্শিয়ে ছাঁটাই করার বেলায় বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যানের পূর্বানুমতি পেয়েছেন। এ ধরনের কোন কোন ছাঁটাই সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের ইউনিয়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিণতি বলে সন্দেহ হলে শ্রমিক সংগঠনগুলো বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যানের কাছে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নির্বাহী চেয়ারম্যান দাবি করেন, প্রতিটি ছাঁটাই ঘটনার দায়-দায়িত্ব কারখানা মালিকদেরই বহন করতে হবে বলে তার অফিস জানিয়ে দিয়েছে; যদিও শ্রমিক সংগঠনগুলো জানায়, এই প্রক্রিয়া তেমন কার্যকর ছিলনা।

ইপিজেডের ভেতরে শ্রমিক সমিতিগুলোর সমন্বয়ে ফেডারেশন গঠন করার অধিকারের কথা স্বীকার করা হয়েছে। আগের বছরগুলোর মত আলোচ্য বছরেও সরকার ইপিজেড শ্রম ট্রাইবুনাল বা ইপিজেড শ্রম আপিল ট্রাইবুনাল গঠন করেনি, যদিও ইপিজেড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী এই ধরনের ট্রাইবুনাল গঠনের কথা। ইপিজেডগুলোতে ইপিজেড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অ্যাক্ট-এর বিধানের বাইরেও শ্রম আইনে দেয়া বৃহত্তর শ্রমিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শ্রমিকরা জাতীয় শ্রম আদালতগুলোর শরণাপন্ন হতে শুরু করেছেন।

শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, সারাবছরই তারা ভয়ভীতি ও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের নজরদারির মধ্যে ছিলেন। তারা জানান, সারাদেশে বিক্ষিপ্তভাবে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন, এক তরফা লক আউট ঘোষণা, শ্রমিক ছাঁটাই এবং নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেদের বর্ধিত নজরদারি হরহামেশাই চলেছে বলে শ্রমিক সংগঠকরা জানিয়েছেন।

কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও শ্রমিকদের ধরপাকড় করেছে যাকে কিছু এনজিও শ্রম অধিকার কর্মীদের ওপর দমন বলে আখ্যায়িত করেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ২৪শে জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ মেহেদী হাসানকে আটক করে। কারণ, ওয়ার্কার্স রাইটস কনসর্টিয়ামের এই কর্মী শ্রমিকদের প্রতিবাদের বিষয়ে তদন্ত করছিলেন। এনজিওগুলো জানায়, অনুরূপ শ্রমিক প্রতিবাদ আর যাতে কেউ না করতে পারে সেজন্য মেহেদীকে গ্রেফতার করা হয়। অনেকটা বিদেশী চাপে মেহেদীকে ৩রা ফেব্রুয়ারি মুক্তি দেয়া হয়।

অনুরূপভাবে, অধিকার ও প্রচার মাধ্যমের খবর অনুযায়ী ১৮ই জানুয়ারি পুলিশ মিরপুর ও কচুক্ষেতে শ্রমিকদের প্রতিবাদ সমাবেশে যোগদান করার কারণে ১১ জন শ্রমিককে আটক করে। এসব প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠি চালায় এবং কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। এতে প্রায় একশত লোক আহত হন। অন্যান্যের মধ্যে চারজন শ্রমিক নেতাকেও জরুরি ক্ষমতা আইন ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়াও এদের একজনের বিরুদ্ধে একজন অফিসারকে মারধর করার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে কারখানায় এবং যানবাহনে ভাঙ্গচুর চালানোর অভিযোগ আনা হয়। বছরের শেষ নাগাদও মামলা দুটি অব্যাহত ছিল।

গ. বাধ্যতামূলক বা জোর করে শ্রম আদায়

বাংলাদেশ শ্রম আইনে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় বা কাউকে আটকে রেখে তার কাছ থেকে শ্রম আদায়, ১৪ বছরের কম বয়সীদের দিয়ে কাজ করানো নিষিদ্ধ; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের কাজ করা আইনত সিদ্ধ রয়েছে। সরকার কার্যকরভাবে এই সব বিধিনিষেধ কার্যকর করেননি। বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে আইনকে জোরদার করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইনে পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে এই আইন সেভাবে প্রয়োগ হয়নি।

সরকার বড় বড় সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে জোর করে শ্রম আদায়ের ঘটনা কিছুটা বন্ধ করতে সফল হয়েছে। তবে ট্যানারি, জাহাজ ভাঙ্গা, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ, রেস্টুরেন্ট, বাসাবাড়ির কাজকর্মে জোর করে শ্রম আদায়ের ঘটনা ঘটেছে বলে বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন, এনজিও ও পত্র-পত্রিকা উল্লেখ করেছে।

বাসাবাড়ির কাজে নিয়োজিতদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের অনেক ঘটনার খবর জানা যায়। যেসব গৃহকর্তা গৃহপরিচারিকাদের ওপর নির্যাতন করে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। অনেক নির্যাতিত দরিদ্র পরিবার ক্ষতিপূরণের টাকার বিনিময়ে নিষ্পত্তির পথ বেছে নেয়। নারী ও শিশু পাচারের সমস্যা রয়ে গেছে।

ঘ. শিশুশ্রম রোধ এবং চাকুরির ন্যূনতম বয়স

বাংলাদেশ শ্রম আইন কাজের ধরন ও শিশুর বয়স অনুযায়ী শিশুদের চাকুরি নিয়ন্ত্রণ করে। দেশে ব্যাপক দারিদ্র্য থাকায় অতি অল্প বয়সে অনেক শিশু কাজ করা শুরু করে। ২০০৬ সালে আইএলও বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০০৫ সালে একটি বেসলাইন জরিপ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম খাত নির্ধারণের জন্য এবং তাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করে। কোন্ কোন্ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে শিশুশ্রম বিদ্যমান তা নিরূপন করতে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল। এই জরিপে দেখা যায় যে, নির্ধারিত ৪৫টি ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে কর্মরত ২২ লাখ শ্রমিকের মধ্যে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু শ্রমিক রয়েছে ৫ লাখ ৩২ হাজার। এই জরিপে আরো বলা হয়, জরিপকালীন সময়ে জাহাজভাঙ্গা, সিগারেট কারখানা, কীটনাশক কারখানা বা আতশবাজি কারখানায় কোন শিশু শ্রমিক কাজ করেনি। তবে করাত কল, ব্যাটারি রিচার্জকরার কারখানা, ওয়েল্ডিং কারখানা, মেটাল কারখানা এবং কাঠমিস্ত্রির কারখানার মত ঝুঁকিপূর্ণ কারখানায় শিশু শ্রম ছিল বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয়, এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক শিশু শ্রমিক মৌখিক ও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছে।

আলোচ্য ২০০৮ সালে সরকার আইএলও বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহায়তায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি শিশু শ্রম ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। শিশুশ্রমের ব্যাপারে সকল পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত হস্তক্ষেপের জন্য এই ইউনিট গঠন করা হয়।

শিশুরা বাসাবাড়ির কাজকর্মে সবসময়ই নিয়োজিত থেকেছে। গৃহপরিচারিকা নির্যাতনকারী গৃহকর্তাদের বিরুদ্ধে সরকার কখনও কখনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। দেশের আইনে প্রত্যেক শিশুর জন্য পঞ্চম শ্রেণী বা ১০ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করা বাধ্যতামূলক। তবে এই বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের কোন আইনগত কার্যকর বিধান নেই।
রফতানিমুখী পোশাক খাত ছাড়া শিশু শ্রম আইনের প্রয়োগ তেমন ছিল না। বাংলাদেশ শ্রম আইনে শিশুশ্রম আইন লঙ্ঘনের শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এই শাস্তি সাধারণত ৫ হাজার টাকা। কৃষি ও অন্যান্য অ-প্রচলিত খাতের ওপর সরকারি নজরদারি তেমন নেই, আর এসব খাতেই সবচেয়ে বেশি শিশু শ্রমিক নিয়োজিত।

ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য শর্তাবলি

যে সব শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো রয়েছে সেগুলো ছাড়া অন্য সব অর্থনৈতিক খাতের শ্রমিকদের জন্য জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি বোর্ড ২০০৭ সালে একটি নতুন মজুরি কাঠামো ঘোষণা করে। সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি ধরা হয় ১,৮০০ টাকা। ধার্যকৃত মজুরির এই নিম্ন হার এবং মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হারের কারণে এডভোকেসি গ্রুপগুলো বলে, ধার্যকৃত এসব মজুরি কোন ভাবেই ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচার মত নয়। এই বোর্ড প্রতি পাঁচ বছর পরপর শ্রমিকদের দক্ষতার মান অনুযায়ী প্রতিটি শিল্পের জন্য আলাদা আলাদা মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সুপারিশ করে। দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিক না থাকায় পোশাক শিল্পে ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কখনও কখনও অধিক মজুরিও পাওয়া গেছে। দেশের ইপিজেডগুলোয় মজুরির হার জাতীয় মজুরি হারের চেয়ে বেশ বেশি ছিল। তবে অনেক পোশাক কারখানায় শ্রমিকদেরকে ওভারটাইম করতে বাধ্য করা হয়েছে, শ্রমিকদের মজুরি দেরি করে পরিশোধ করা হয়েছে এবং ছুটির আর্থিক সুযোগপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) জানায় যে, জরিপ করা শতকরা ৯৯ ভাগ পোষাক কারখানায় বর্ধিত মজুরি কার্যকর করা হয়েছে। যে ৩২টি কারখানায় এই বর্ধিত মজুরির হার বলবৎ পাওয়া যায় নাই সেগুলো অন্য কারখানার হয়ে চুক্তিতে কাজ করে বলে বিজিএমই দেখতে পেয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো বিজেএমই'র যাচাই মানদণ্ড নিয়ে আপত্তি তুলেছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানদণ্ড নিরূপণ করা আছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো জানায়, আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত এই মানদণ্ড যথেষ্ট, কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়ন কদাচিৎ হয়ে থাকে। এই আইনের বিধান প্রয়োগ না হলে শ্রমিকরা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন, তবে আইনের আশ্রয় নেয়ার ঘটনা একেবারে হাতে গোনা। শ্রম আইন বাস্তবায়নে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শিল্প পরিদর্শকদের ভূমিকাও দুর্বল। এর প্রধান কারণ হল তাদের সংখ্যার স্বল্পতা আর এই খাতে প্রচলিত ভয়ানক দুর্নীতি এবং সেই সাথে পরিদর্শকদের অদক্ষতা। বেকারত্বের অধিক হার এবং আইনের দুর্বল প্রয়োগের কারণে বিপজ্জনক কাজের পরিবেশের সংশোধনী দাবি করা অথবা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে অস্বীকার করলে শ্রমিকদের চাকুরি হারানোর ভয় ছিল। আট ঘণ্টায় এক কর্ম দিবস; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক ১০ ঘণ্টা কাজ করতে পারেন। ওভারটাইমের অনুমতি রয়েছে তবে সে ক্ষেত্রে মালিককে মূল বেতন ও অন্যান্য ভাতার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হয় এবং অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তী মজুরি দিতে হয়।

আদর্শ শ্রম সপ্তাহ হচ্ছে ৪০ ঘণ্টা, তবে ওভারটাইম পরিশোধ করলে তা ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত করার বিধান আছে। তবে বছরে গড় শ্রম সপ্তাহ ৫৬ ঘণ্টার বেশি হবে না। শ্রমিকরা যদি দৈনিক ৬ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন তাহলে তারা বিরতি পাবেন ১ ঘণ্টা, ৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করলে পাবেন আধ ঘণ্টা, এবং ৮ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করলে ১ ঘণ্টার করে বিরতি পাবেন। কারখানার শ্রমিকরা সপ্তাহে একদিন ছুটি পান। দোকান কর্মচারীরা পান সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি।